সমুদ্রতরঙ্গ, হিমবাহ দ্বারা বহুদিন ধরে শিলা ও শিলা গঠনকারী খনিজগুলো ক্ষয় হয়ে সূক্ষ্ম শিথিল শিলাচূর্ণ রূপে অবস্থান করে। এই শিলাচূর্ণ হলো রেগোলিথ। পরে এর সাথে জল, বায়ু, জৈবপদার্থ মিশে মাটির সৃষ্টি হয়। মাটির চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই তার নীচের পৃষ্ঠ বা আদিশিলার ওপর নির্ভর করে। যেমন— সাধারণত ব্যাসল্ট শিলায় কৃষ্ণমৃত্তিকা, গ্রানাইট শিলায় লোহিত মৃত্তিকা, বেলেপাথরে বেলেমাটি তৈরি হয়।

কৃষ্ণমৃত্তিকা

লোহিত মৃত্তিকা

বেলে মাটি

ঠিকঠিক মিলিয়ে ফেলো

১) চুনাপাথর	গোলাকার ভূমিরূপ
২) বেলেপাথর	শিলার রূপান্তরের একটি কারণ
৩) গ্রানাইট	জিপসাম
৪) প্রচণ্ড চাপ	স্ট্যালাকটাইট
৫) ব্যাসল্ট	চ্যাপ্টা ভূমিরূপ
৬) মার্বেল	রূপান্তরিত শিলা
৭) পটাশিয়াম	অর্থোক্লেজ ফেল্ডসপার
৮) ক্যালশিয়াম সালফেট	পাললিক শিলা

আমাকে চিনে নাও —

- আমি মসৃণ, দেখতে খুব সুন্দর। নানা রঙে আমায় পাওয়া যায়। আমি ঘরবাড়ির মেঝে তৈরির কাজে আসি। বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর মতো স্থাপত্যশিল্পে আমার ব্যবহার আছে।
- আমি খুব শক্ত, সূক্ষ্ম দানার কালো- ধূসর রঙের শিলা। রাস্তাঘাট নির্মাণে আমার ব্যবহার হয়ে থাকে। আমার মধ্যে দিয়ে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

আমাদের জীবনে শিলা

আগ্নেয় শিলার ব্যবহার

ব্যাসল্টে তৈরি

গ্রানাইটে তৈরি

আমাদের জীবনে শিলা

পাললিক শিলার ব্যবহার

চুনাপাথরে তৈরি

বেলেপাথরে তৈরি

আমাদের জীবনে শিলা

রূপান্তরিত শিলার ব্যবহার

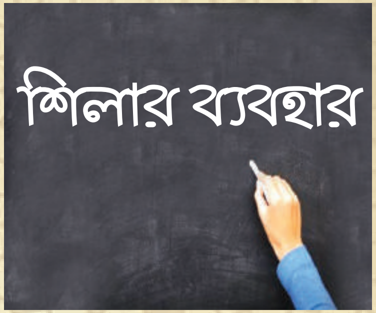

স্লেটে তৈরি

মার্বেলে তৈরি

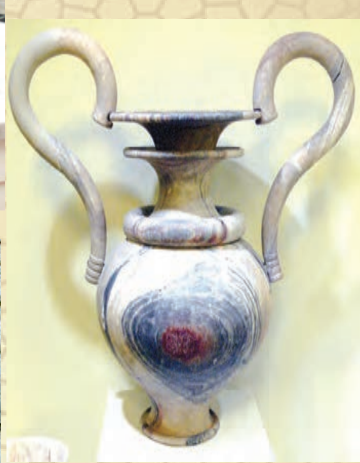

সহজে চিনে নাও

তোমার বাড়ি, স্কুল, আশেপাশের অঞ্চল থেকে শিলা জোগাড় করো। প্রয়োজনে জল ও ব্রাশের সাহায্যে ভালো করে পরিষ্কার করে নাও। এরপর শিলাগুলো চেনার চেষ্টা করো।

শিলার নাম :   শিলার নমুনার নম্বর :

শিলাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো :

সছিদ্রতা আছে/নেই	প্রবেশ্যতা আছে/নেই	চকচকে/চকচকে নয়	মসৃণ/অমসৃণ	গোলাকার/চ্যাপটা/কোণাকৃতি	রং

শিলাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো :

দানা— বড়ো/ মাঝারি/ ছোটো	শিলায় দাগ কাটা যায়/ যায় না	ভারী/ হালকা	সহজে ভাঙা যায়/ যায় না	বিশেষ বৈশিষ্ট্য

(শিলাগুলো ভালোভাবে চিনতে প্রয়োজনে আতস কাচ, পয়সা, জল প্রভৃতি ব্যবহার করো।)

ওপরের লেখাগুলো থেকে যা যা বৈশিষ্ট্য পেলে সেগুলো নিয়ে একটা অনুচ্ছেদ লিখে ফেলো। বন্ধুরা মিলে একে অপরের লেখাগুলো দেখো। দেখবে তোমরা নিজেরাই হয়ে উঠেছ এক একজন শিলা বিশারদ!

শব্দছক সমাধান

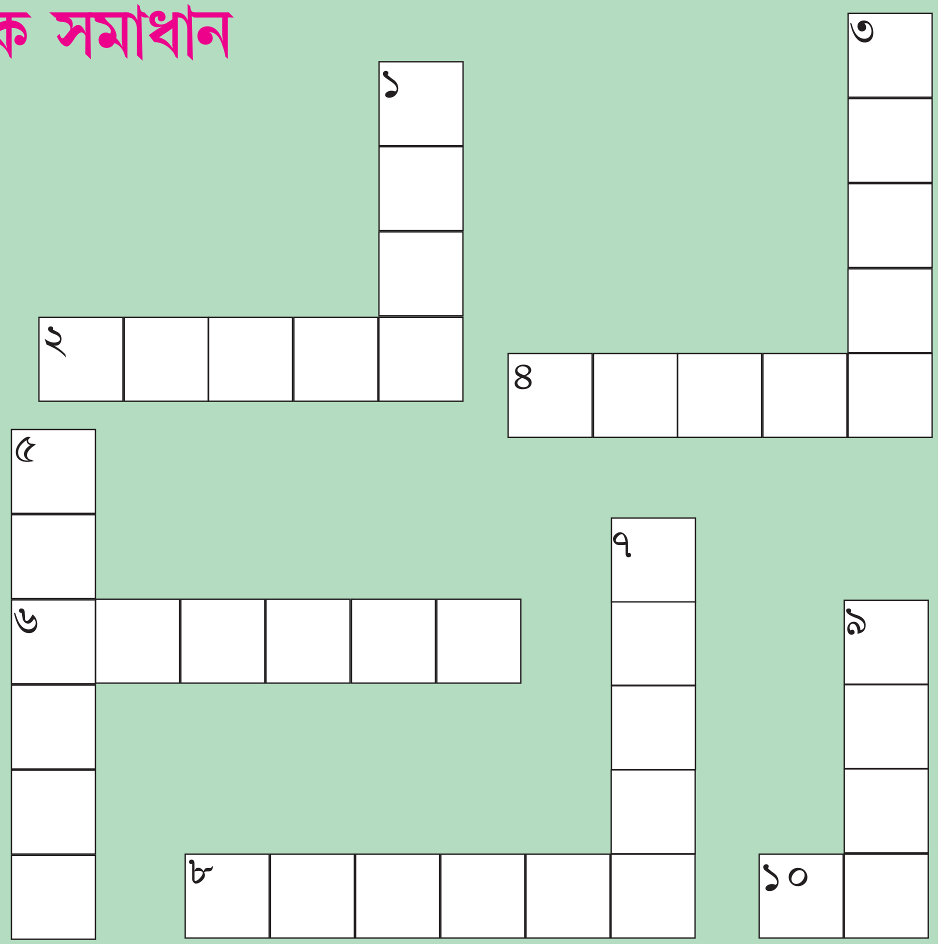

ওপর-নীচ

১। পাতালিক শিলার উদাহরণ

৩। বালিময় পাললিক শিলা

৫। গুহায় ঝুলন্ত চুনাপাথরের দণ্ড

৭। কালো রঙের অভ্র

৯। কয়লার রূপান্তরিত রূপ

পাশাপাশি

২। উপপাতালিক শিলার উদাহরণ

৪। ক্যালশিয়াম কার্বনেট

৬। প্রস্তরময় পাললিক শিলা

৮। সাদা রঙের অভ্র

১০। শেলের রূপান্তরিত রূপ

চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ

সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবী হলো বায়ুর চাদরে মোড়া একমাত্র গ্রহ। বায়ুর ওজন আছে, বায়ু পৃথিবী পৃষ্ঠে চাপ দেয়। এই চাপই বায়ুর চাপ। স্থান ও সময় বিশেষে এই চাপের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোথাও চাপ বেশি (উচ্চ), আবার কোথাও কম (নিম্ন)।

➢ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুচাপের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণগুলো তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে জেনেছ। পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর নির্দিষ্ট দূরত্বে সমধর্মী বায়ুস্তর অনুভূমিকভাবে প্রায় হাজার কিলোমিটার জুড়ে পুরো পৃথিবীকে কয়েকটি বলয়ের আকারে বেষ্টন করে আছে। একে বলে বায়ুচাপ বলয় (Pressure Belts)।

বায়ুচাপ বলয়

নিরক্ষীয় অঞ্চল : নিরক্ষরেখার দুপাশে ০° থেকে ৫° অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হলো নিরক্ষীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলে একটি বায়ুচাপ বলয় অবস্থান করছে।

দেখা যাক সেটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত—

- নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে। ফলে এখানকার বায়ু সারা বছর উষ্ণ থাকে।
- এই অঞ্চলে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ বেশি। উষ্ণ বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা বেশি হয়। আবার উষ্ণ বায়ুর ঘনত্ব কম বলে এটি হালকা হয়। এই হালকা জলীয়বাষ্পযুক্ত বায়ু প্রসারিত হয়ে ওপরে ওঠে।
- এই ঊর্ধ্বগামী বায়ু পৃথিবীর আবর্তন গতির কারণে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছিটকে যায়। ফলে এই অঞ্চলে বায়ুর পরিমাণ কমে যায়।

- ভেবে দেখো এইগুলোর জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোন ধরনের (উচ্চচাপ/নিম্নচাপ) বায়ুচাপ বলয় সৃষ্টি হয়েছে?
- দুটো দেশ ও দুটো মহাসাগরের নাম করো যার ওপর দিয়ে এই বায়ুচাপ বলয় বিস্তৃত?

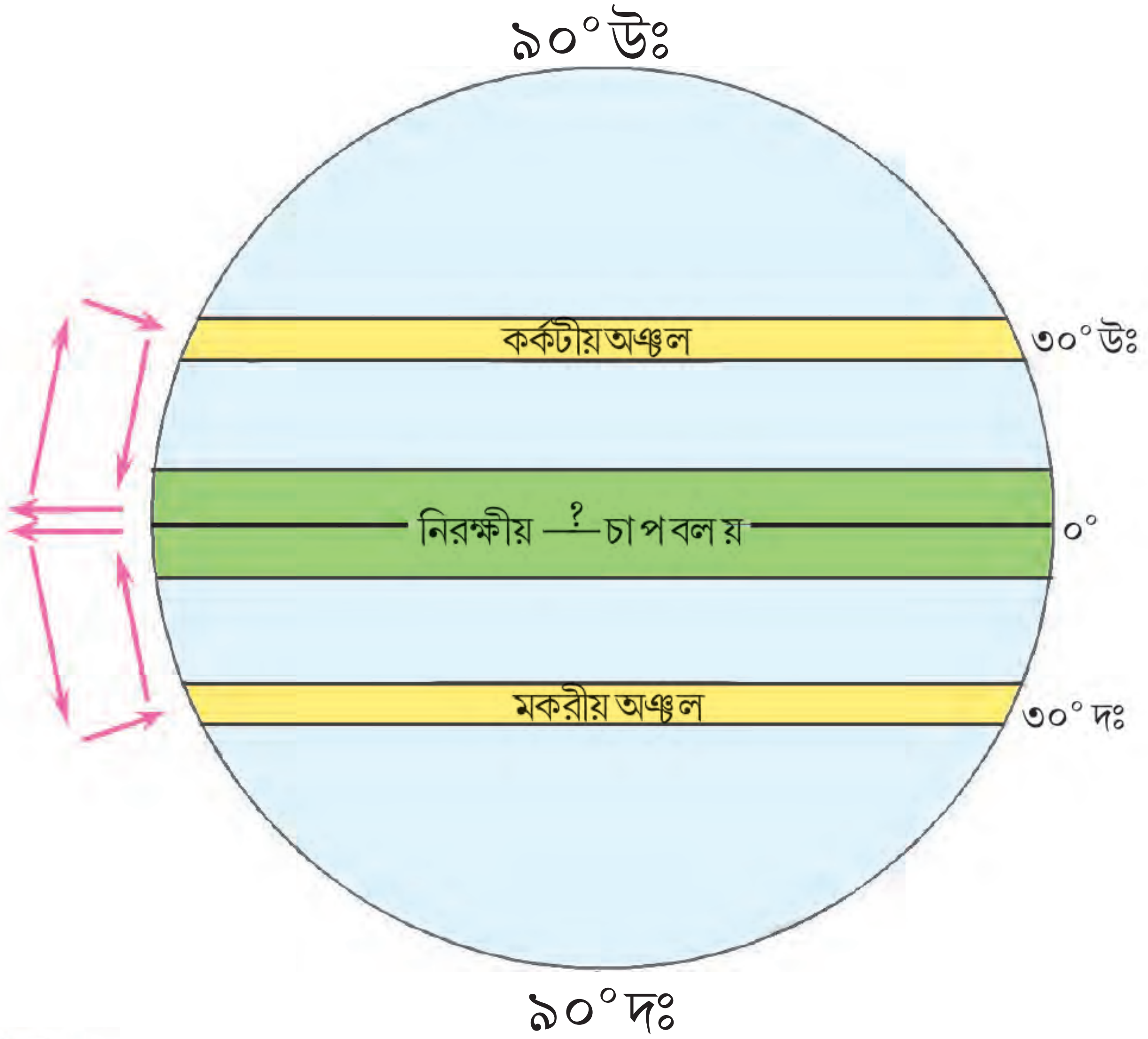

বিশেষ কথা

ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে বায়ুর অনুভূমিক চলাচল হলো বায়ুপ্রবাহ।

ভূপৃষ্ঠের ওপর বায়ুর উল্লম্ব চলাচল হলো বায়ুস্রোত।

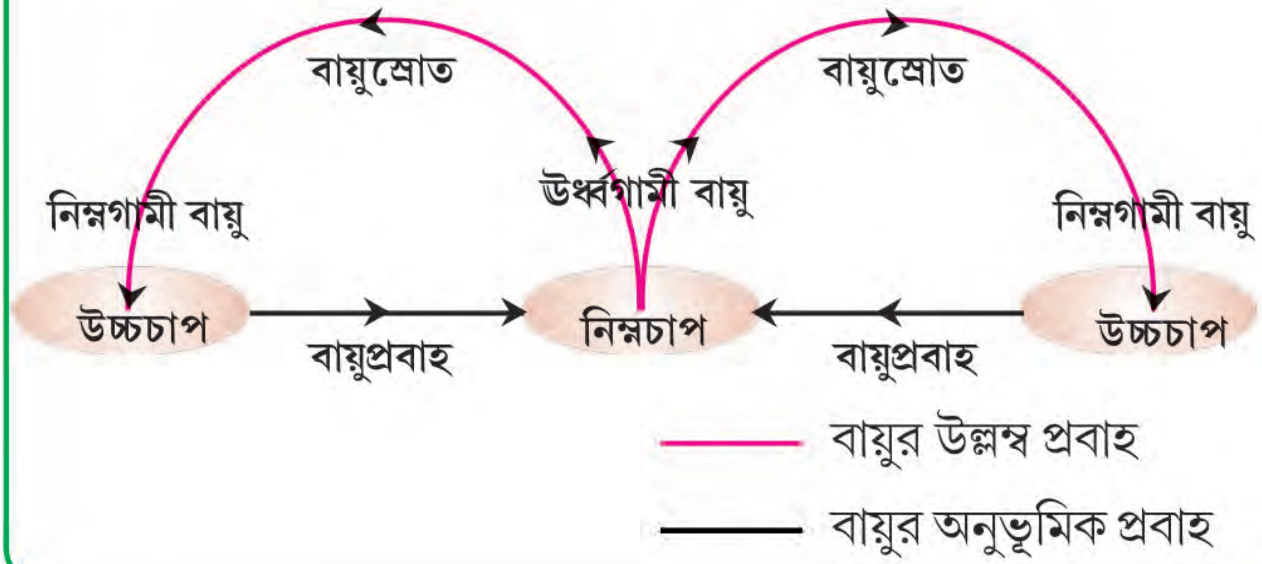

নিরক্ষীয় শান্তবলয় (Doldrums) : নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর উষ্ণ ও হালকা বায়ু সোজা ওপরের দিকে উঠে যাওয়ায় এখানে বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী স্রোত লক্ষ করা যায়। ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে কোনো বায়ু প্রবাহিত হয় না। ফলে এখানে বায়ুর কোনো চলাচল বোঝা যায় না, শান্তভাব বিরাজ করে। তাই এই অঞ্চলের নাম

নিরক্ষীয় শান্তবলয়। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে জাহাজ চালানোর সময় প্রায়ই জাহাজগুলো থেমে যেত। নাবিকরা এই অঞ্চলের নামকরণ করেন '**ডোলড্রামস**' (যার অর্থ শান্তাবস্থা)।

কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চল : উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ২৫° থেকে ৩৫° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চল নামে পরিচিত। এই দুই অঞ্চলে দুটি বায়ুচাপ বলয় সৃষ্টি হয়েছে। নিরক্ষীয় শান্তবলয়ের মতো এই দুই অঞ্চল যথাক্রমে কর্কটীয় শান্তবলয় ও মকরীয় শান্তবলয় নামে পরিচিত।

দেখা যাক অঞ্চল দুটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত—

➢ নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে উষ্ণ, আর্দ্র ও হালকা বায়ু ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশ কমতে থাকে। বায়ু ঠান্ডা ও ভারী হয়ে

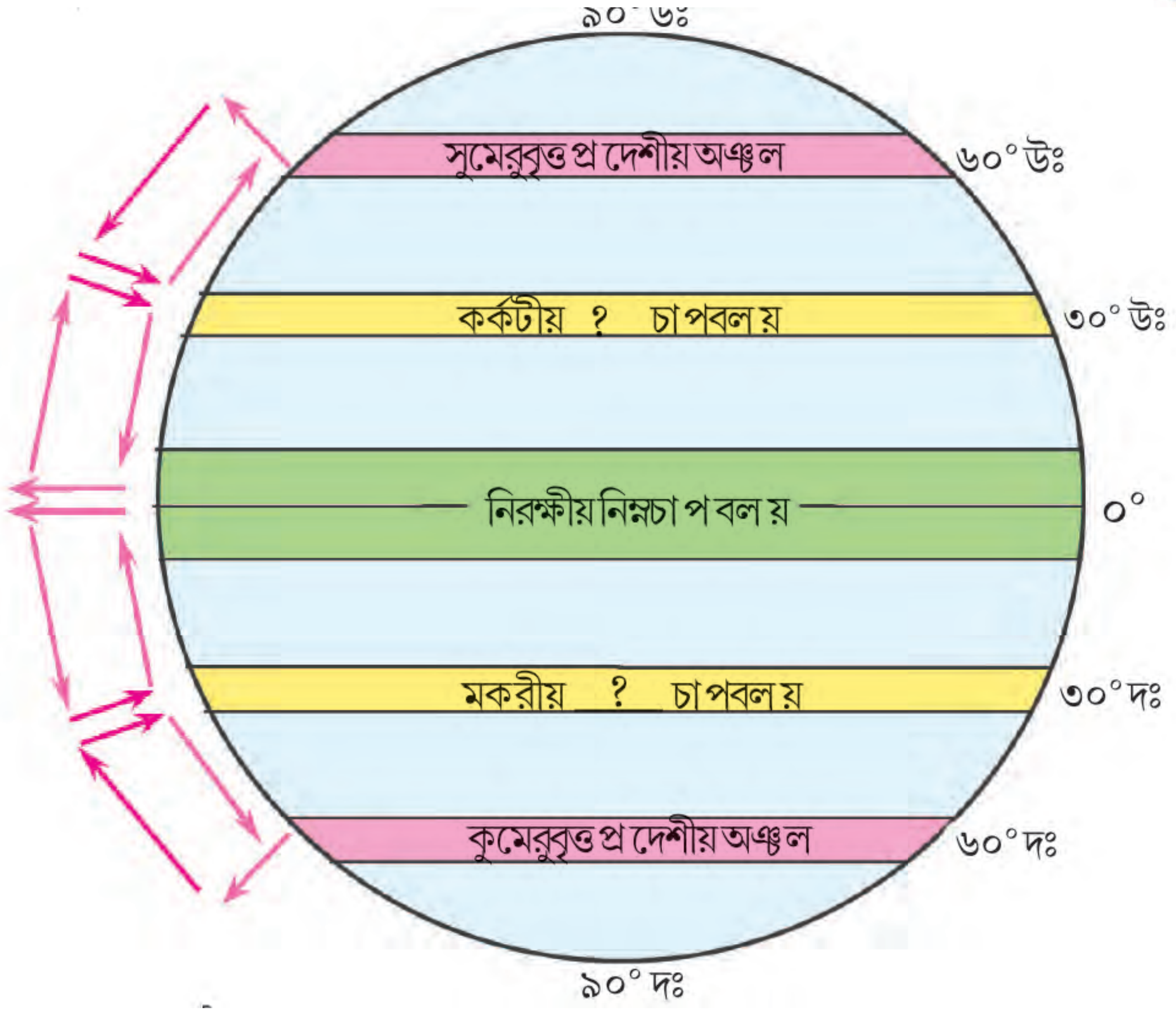

ওঠে এবং ঘনত্ব বেড়ে যায়। নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে এই ঊর্ধ্বগামী বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের ফলে বিক্ষিপ্ত হয়।

➢ এই বিক্ষিপ্ত শীতল ও ভারী বায়ু কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চলে নেমে আসে। আবার মেরু অঞ্চল থেকে ঠান্ডা

ও শুষ্ক বায়ু নীচের দিকে নেমে এসে দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থান করে।

➤ দুটি বিপরীতধর্মী বাতাস দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলে মিলিত হবার ফলে এখানে বায়ুর পরিমাণ বেড়ে যায়, ঘনত্বও বাড়ে।

- এই কারণগুলোর জন্য কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চলে কোন ধরনের বায়ুচাপ বলয় অবস্থান করে?
- কর্কটীয় ও মকরীয় বলয়কে শান্তবলয় বলার কারণ কী?

অশ্ব অক্ষাংশ

ষোড়শ শতকে কর্কটীয়-মকরীয় শান্তবলয় দিয়ে পালতোলা জাহাজগুলো চলাচলের সময় গতিহীন হয়ে পড়ত। ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ থেকে আসা ঘোড়াভর্তি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর পশ্চিম ভারতীয়

দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকায় যেতে অনেক বেশি সময় লাগত। এই অবস্থায় জাহাজের ভার কমাতে এবং পানীয় জল ও খাবারের সংকট এড়াতে

কিছু জীবন্ত ঘোড়াকে আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দিতে হতো। এই কারণে দুই ক্রান্তীয় অঞ্চল (২৫°-৩৫° উঃ ও দঃ) **অশ্ব অক্ষাংশ** নামে পরিচিত।

- অশ্ব অক্ষাংশ বরাবর পালতোলা জাহাজগুলো গতিহীন হয়ে পড়ত কেন?

মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল : উভয় গোলার্ধে ৬০° থেকে ৭০° অক্ষরেখার মাঝের অঞ্চল অর্থাৎ সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত বরাবর দুটি চাপবলয় অবস্থান করে। এই দুটি চাপবলয় উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয়

চাপবলয় ও দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় চাপবলয় নামে পরিচিত।

দেখা যাক এই চাপবলয় দুটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত —

- দুই গোলার্ধের মেরু অঞ্চলের তুলনায় পার্শ্ববর্তী মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলের উষ্ণতা বেশি হয়। ফলে এই অঞ্চলের বায়ু হালকা হয়ে ওপরে ওঠে ও প্রসারিত হয়।
- এই ঊর্ধ্বগামী বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের কারণে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে উভয় গোলার্ধের ক্রান্তীয় ও মেরু অঞ্চলের দিকে নেমে আসে। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল থেকে ঊর্ধ্বগামী বায়ু উত্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে সুমেরু অঞ্চলে নেমে আসে। আবার দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত হয়ে

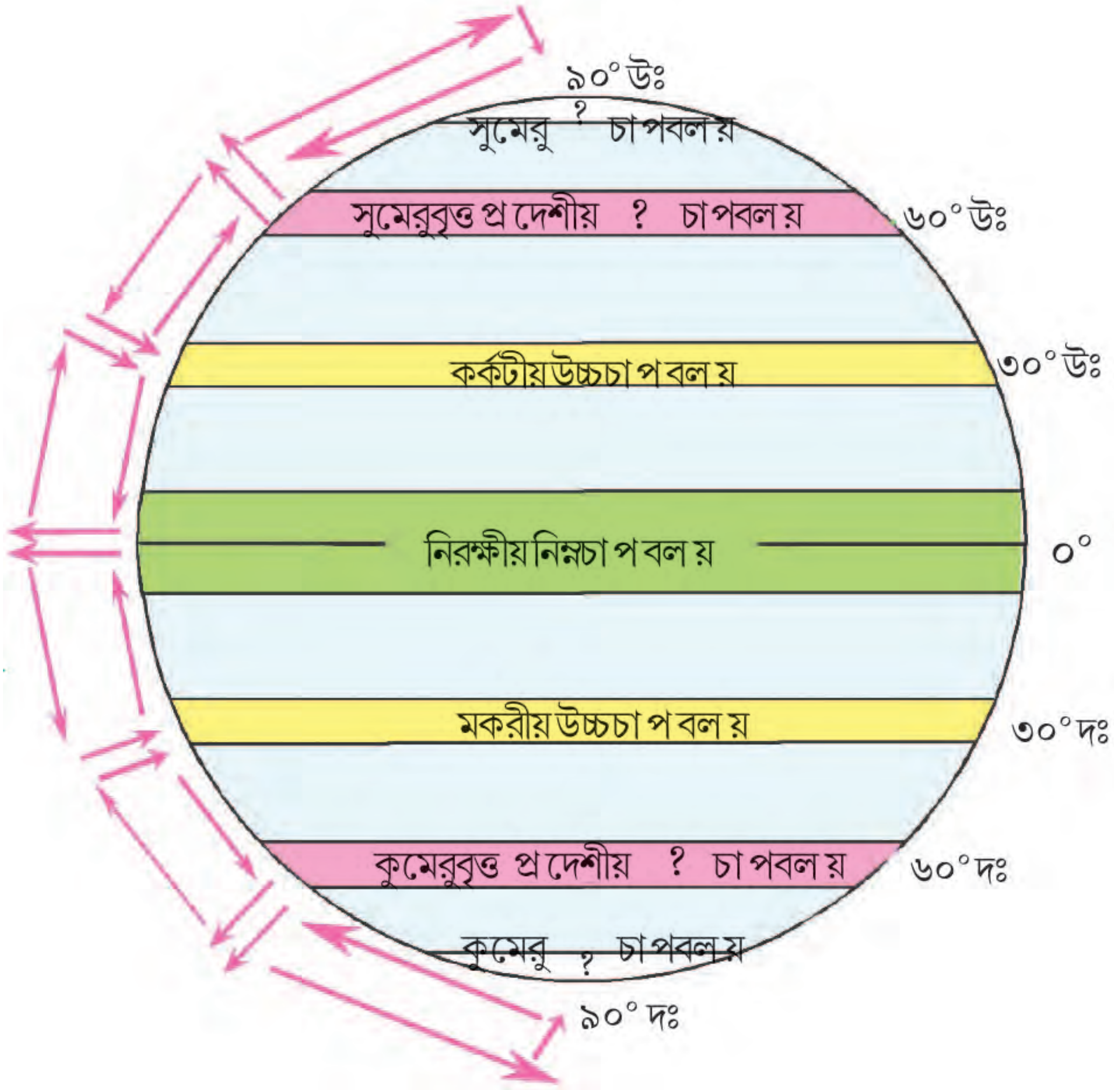

কর্কটীয় অঞ্চলে নেমে আসে। ফলে দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলে বায়ুর পরিমাণ কমে, ঘনত্ব হ্রাস পায়।

- ভেবে বলো দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে বায়ুর কী ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়?

- দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল থেকে বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়ে কোন কোন অঞ্চলে নেমে আসে ?

মেরু অঞ্চল : দুই গোলার্ধে ৮০° অক্ষরেখা থেকে মেরু বিন্দু মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুটি বায়ু চাপবলয় সৃষ্টি হয়েছে।

দেখা যাক এই চাপ বলয় দুটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত —

➢ দুই মেরু অঞ্চল প্রায় সারাবছর বরফে ঢাকা থাকায় উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। তাই এখানকার বাতাস ভীষণ শীতল ও ভারী।

➢ এই অঞ্চলে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায় তাপের অভাবে বাষ্পীভবনের পরিমাণ খুব কম। ফলে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণও কম থাকে।

➢ পৃথিবীর আবর্তনের কারণে মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল থেকে বায়ুর কিছু অংশ মেরু অঞ্চলে নেমে আসে।

- এই কারণগুলোর জন্য দুই গোলার্ধে মেরু অঞ্চলে কী ধরনের বায়ুচাপ বলয় অবস্থান করে?
- সুমেরু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দুটো দেশ ও দুটো সাগরের নাম লেখো।

আলোচনা করে নীচের প্রশ্নগুলো সমাধান করার চেষ্টা করো :

- পৃথিবীতে কটা বায়ুচাপ বলয় আছে তাদের নাম লিখে ফেলো।
- বায়ুচাপ বলয়গুলোর অক্ষাংশগত বিস্তৃতি উল্লেখ করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

- অক্ষাংশগত বিস্তৃতির উল্লেখ করে অশ্ব-অক্ষাংশ এবং ডোলড্রাম অঞ্চলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।
- কোন কোন বায়ুচাপ বলয় থেকে বায়ু উল্লম্বভাবে বিক্ষিপ্ত হয় এবং কোন কোন বায়ুচাপ বলয়ে এসে বায়ু মিলিত হয় এঁকে বোঝাও।
- দুই ক্রান্তীয় অঞ্চল এবং দুই মেরু অঞ্চলে বায়ুর ঘনত্ব বেশি হয় কেন?

বায়ুপ্রবাহ

চাপের সমতা বজায় রাখার জন্য বায়ু সবসময় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। দুটো অঞ্চলের মধ্যে চাপের পার্থক্য বায়ু চলাচলের অন্যতম প্রধান কারণ। উচ্চচাপ ও নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে চাপের পার্থক্য বেশি হলে বায়ুর

গতিবেগ বাড়ে, আবার চাপের পার্থক্য কমলে বায়ু ধীর গতিতে বয়। যখন চাপের পার্থক্য প্রায় থাকে না, শান্ত আবহাওয়া বিরাজ করে।

➤ পাশের ছবিটা লক্ষ করে দেখো --- এভাবে ঘোরার সময় ওদের বাইরের দিকে ছিটকে যাবার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে কেন্দ্র বহির্মুখী বল (Centrifugal force) কাজ করায় তারা পেছনের দিকে হেলে পড়ছে।

পৃথিবীর আবর্তন বা ঘূর্ণন গতির কারণে পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ যেকোনো স্বচ্ছন্দ, গতিশীল বস্তুর ওপর একধরনের বল কাজ করে যা বস্তুগুলোর দিক বিক্ষেপ (পরিবর্তন) ঘটায়। এই বল হলো কোরিওলিস বল (Coriolis force)। পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে চলাচলকারী বাতাস ও সমুদ্র স্রোতের ওপর সাধারণভাবে এই বল কাজ করে।

এই কোরিওলিস বলের কারণে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে চলাচলের সময় বায়ু সোজাপথে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে

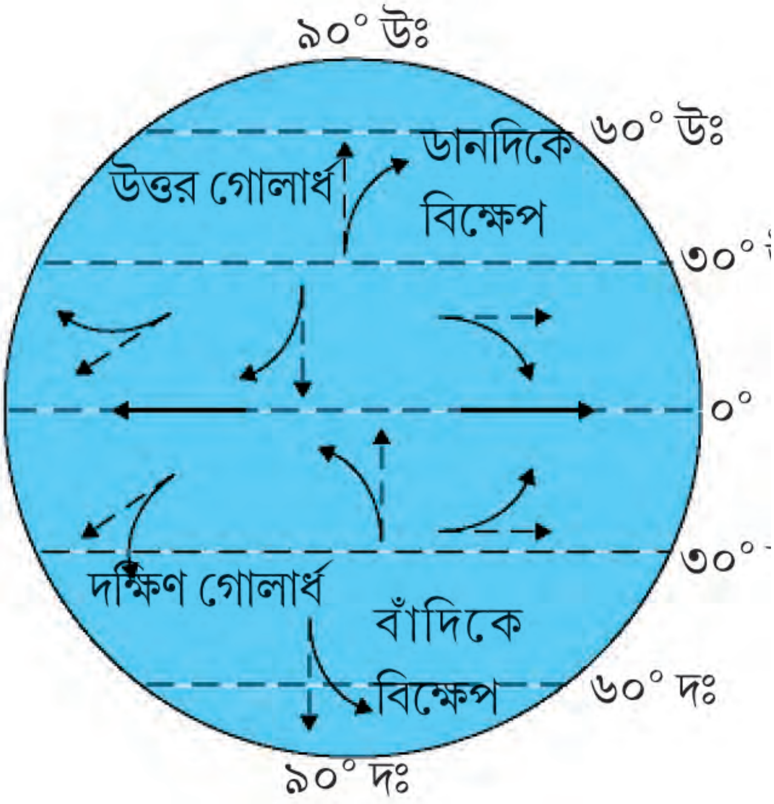

তার প্রবাহের ডানদিকে বেঁকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে তার প্রবাহের বাঁদিকে বেঁকে চলাচল করে। মার্কিন আবহবিদ উইলিয়ম ফেরেল প্রথম এই বিষয়টি উল্লেখ করায় এটি ফেরেলের সূত্র নামে পরিচিত।

এঁকে ফেলো

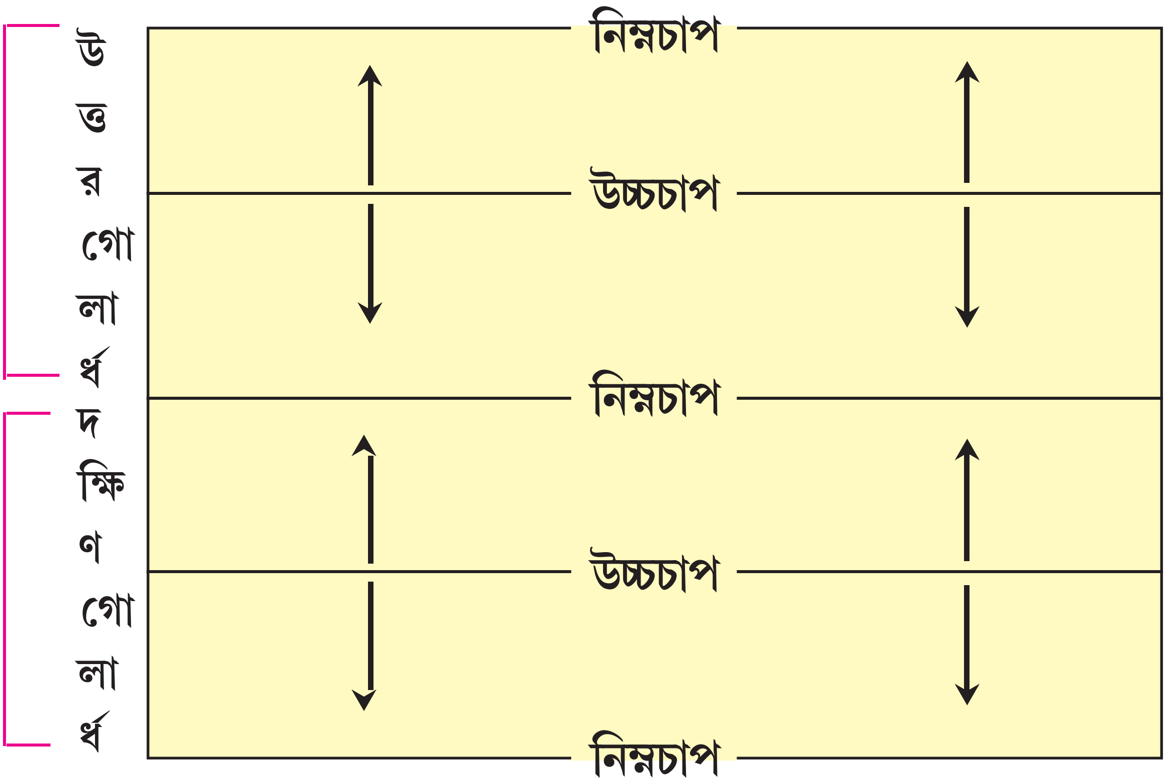

বায়ুপ্রবাহের সোজা পথ →

- ফেরেলের সূত্র অনুসারে বায়ু কোন গোলার্ধে কোন দিকে প্রবাহিত হবে তির চিহ্ন দিয়ে দেখাও।

➤ পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিভাগ সব জায়গায় সমান নয়। অসমতল স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঘর্ষণজনিত বাধার কারণে বায়ুর গতিবেগ কমে যায়, দিক পরিবর্তন ঘটে। আবার সমুদ্রের ওপর বা মরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঘর্ষণের প্রভাব কম থাকায় বায়ুর গতিবেগ বেড়ে যায়।

বায়ু প্রবাহের নামকরণ :

বায়ু যেদিক থেকে প্রবাহিত হয় সেই দিক অনুসারে বায়ুর নামকরণ করা হয়।

● বর্ষাকালে আমাদের রাজ্যে যে বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয় সেই বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয়?

বাইস ব্যালট সূত্র

ডাচ আবহবিদ্ বাইস ব্যালট ১৮৫৭ সালে বায়ুচাপের পার্থক্য ও বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে উত্তর গোলার্ধে বায়ু যে দিক থেকে প্রবাহিত হয় সেই দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে ডানদিকে বায়ুর উচ্চচাপ ও বাঁদিকে নিম্নচাপ হয় । দক্ষিণ গোলার্ধে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়।

- মনে করো, তুমি দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ুপ্রবাহের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার কোন দিকে বায়ুর চাপ কী রকম হবে, তা নীচের শূন্যস্থানে লিখে ফেলো।

বায়ুর ? ___

বায়ুর ? ___

নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

সারাবছর ধরে নিয়মিতভাবে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে একইদিকে প্রায় একই গতিবেগে প্রবাহিত বায়ু হলো নিয়ত বায়ু।

নিয়ত বায়ু তিন ধরনের —

আয়ন বায়ুর পরিচয় : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে সারাবছর ধরে প্রায় নিয়মিতভাবে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ু হলো **আয়ন বায়ু (Trade wind)**।

- উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ৫° থেকে ২৫° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই বায়ু প্রবাহিত হয়।

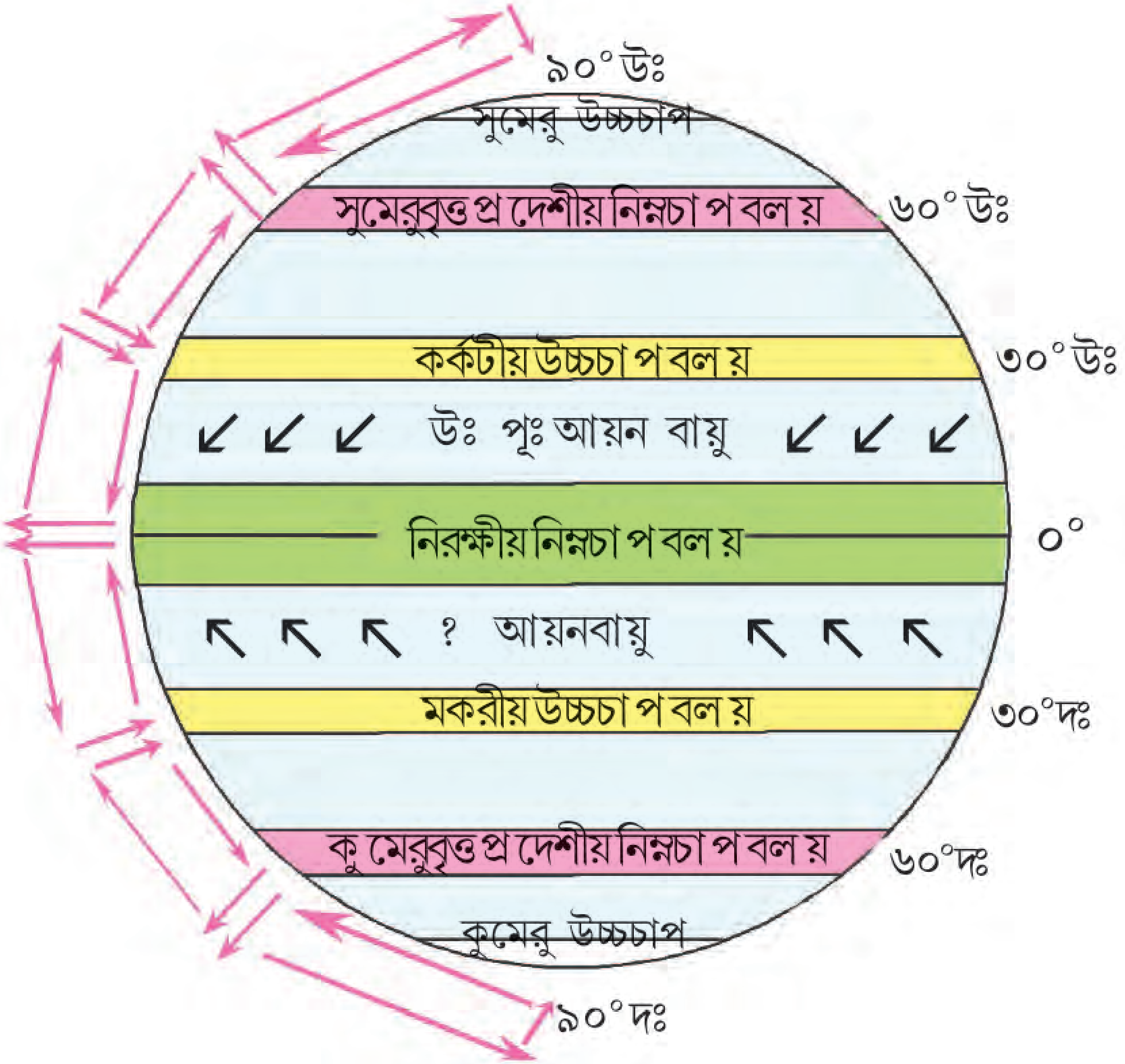

➤ উত্তর গোলার্ধে আয়ন বায়ু কর্কটীয় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে সোজা প্রবাহিত না হয়ে ফেরেলের সূত্র অনুসারে

ডানদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু নামে পরিচিত। দক্ষিণ গোলার্ধে আয়ন বায়ু মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে ফেরেলের সূত্র অনুসারে বাঁ দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

দক্ষিণ গোলার্ধে এই বায়ু কী নামে পরিচিত ?

➤ উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি থাকায় পাহাড়-পর্বত, ঘরবাড়ি, গাছপালায় বাধা পেয়ে আয়ন বায়ুর গতিবেগ কমে যায়। ঘণ্টায় প্রায় ১৬ কিমি বেগে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ বেশি থাকায় ঘর্ষণ বলের প্রভাব কম। তাই এই গোলার্ধে বায়ু ঘণ্টায় প্রায় ২২-৩০ কিমি বেগে প্রবাহিত হয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে মহাদেশের পশ্চিম দিকে পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে কেন?

দুই গোলার্ধে ক্রান্তীয় অঞ্চলের কম উষ্ণ স্থান থেকে তুলনায় বেশি উষ্ণ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে আয়নবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এর উষ্ণতা বেড়ে যায়। জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বাড়ে। ফলে এই বায়ু মহাদেশের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটালেও পশ্চিমাংশে একেবারেই বৃষ্টিপাত হয়না। এই কারণে মহাদেশের পশ্চিমাংশে অধিকাংশ উষ্ণ মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন — আফ্রিকার সাহারা (উত্তর গোলার্ধে), আফ্রিকার কালাহারি (দক্ষিণ গোলার্ধে)।

অন্য নামে আয়নবায়ু

আয়ন বায়ুর ইংরাজি নাম Trade wind, যার আক্ষরিক অর্থ হলো ‘**বাণিজ্য বায়ু**’। আগেকার দিনে পালতোলা জাহাজ এই বায়ু দ্বারাই নির্দিষ্ট গতিপথে বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে চলাচল করত। তাই এই বায়ুর অপর নাম ‘**বাণিজ্য বায়ু**’।

বিশেষ কথা

ITCZ (Inter Tropical Convergence Zone) বা আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল :

উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলে মিলিত হয়। এই স্থানেই আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল বা **ITCZ** । এই অঞ্চলের আরেক নাম নিরক্ষীয় শান্তবলয়।

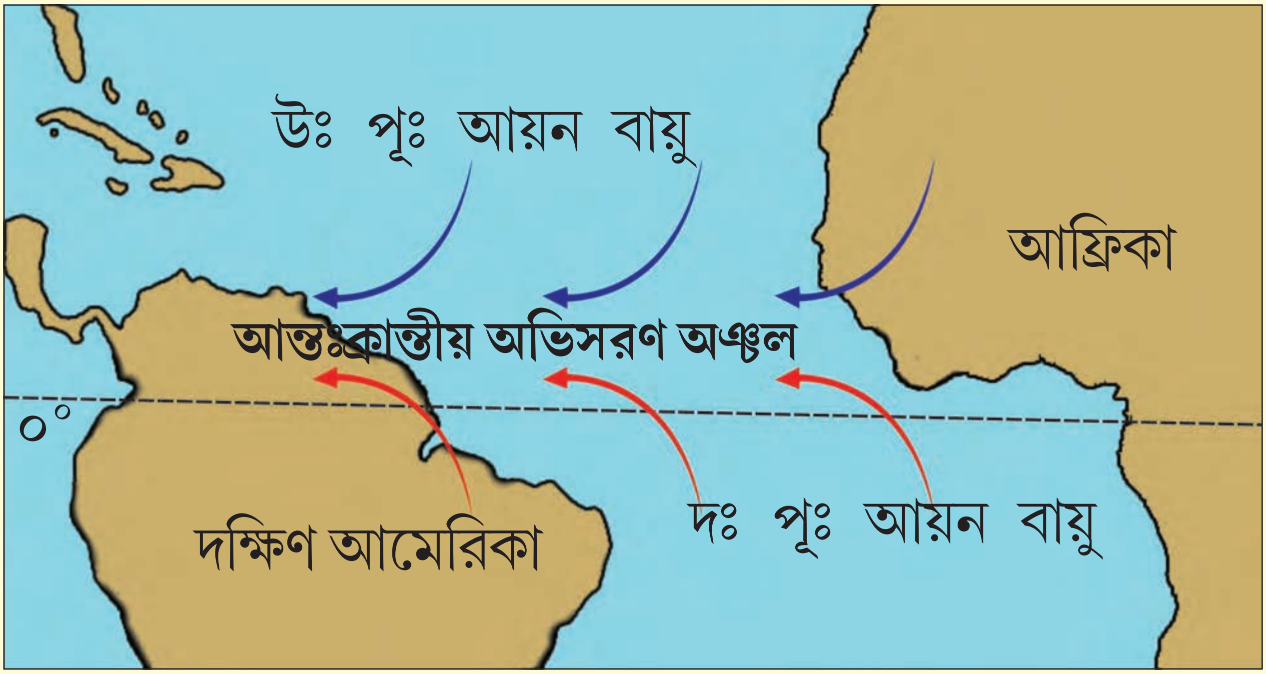

পৃথিবীর তিনটি অংশ জুড়ে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় অবস্থান করছে। সবচেয়ে বড়ো অংশটি ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আরেকটি অংশ রয়েছে আফ্রিকার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর শেষ অংশটি অবস্থান করছে।

পশ্চিমা বায়ু : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে যথাক্রমে সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ু হলো পশ্চিমা বায়ু (Westerlies)। পশ্চিম দিক থেকে চলাচল করায় এই বায়ুর নাম পশ্চিমা বায়ু। সাধারণত এই বায়ু আয়ন বায়ুর তুলনায় কিছুটা অনিয়মিত।

➢ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ৩৫° থেকে ৬০° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়।

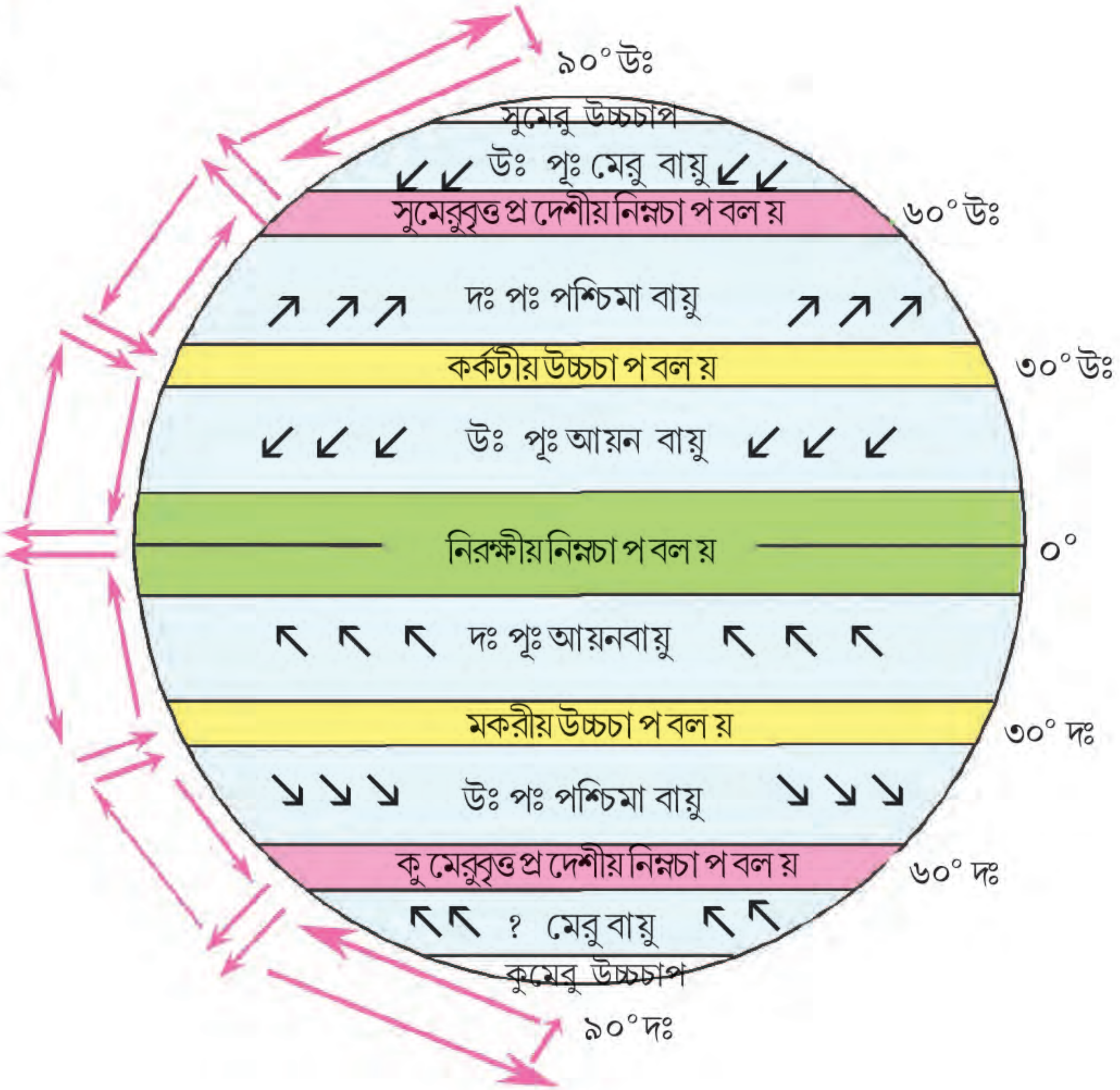

➤ উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হবার সময় ফেরেলের সূত্র অনুসারে ডান

দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। তাই এই বায়ুর নাম দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু। দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ু মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হবার সময় ফেরেলের সূত্র অনুসারে বাঁ দিকে বেঁকে যায়।

➤ উত্তর গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় কম হয়।

- দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং এই বায়ু কী নামে পরিচিত?

- দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ বেশি কেন?

পশ্চিমা বায়ুর প্রবাহ পথে মহাদেশের পূর্ব ও মধ্য অংশে পৃথিবীর অধিকাংশ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে কেন ?

➢ শীতকালে জলভাগ স্থলভাগের তুলনায় বেশি উষ্ণ থাকে। এই সময় জলীয়বাষ্পপূর্ণ পশ্চিমা বায়ু পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহের সময় মহাদেশের পশ্চিমাংশে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। যেমন---ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল। কিন্তু মহাদেশের পূর্বদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। এই কারণে পশ্চিমা বায়ুর প্রবাহ পথে মহাদেশগুলোর পূর্ব ও মধ্য অংশে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন---মধ্যএশিয়ার স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল।

বহুরূপী পশ্চিমা

গর্জনশীল চল্লিশা (Roaring Forties) : ৪০° দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বে সশব্দে প্রবাহিত পশ্চিমা বায়ু।

ক্রোধোন্মত্ত পঞ্চাশ (Howling Fifties) : ৫০° দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর প্রচণ্ড গতিতে প্রবাহিত উন্মত্ত পশ্চিমা বায়ু।

তীক্ষ্ণ চিৎকারকারী ষাট (Screaming Sixties) : ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর তীক্ষ্ণ শব্দে প্রবাহিত পশ্চিমা বায়ু।

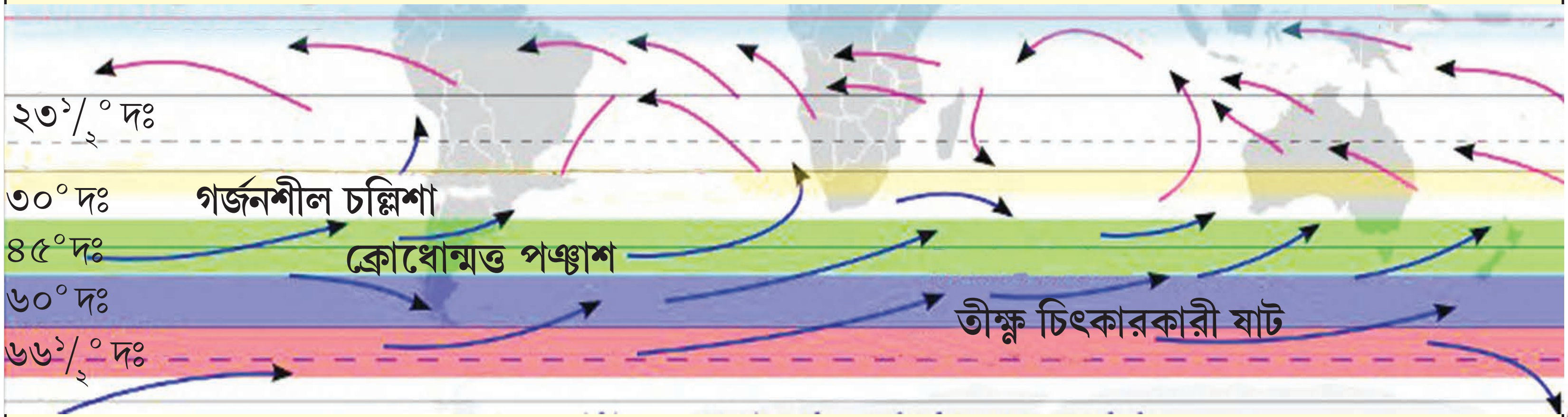

মেরু বায়ু : দুই গোলার্ধে মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শুষ্ক ও শীতল মেরু বায়ু (Polar Wind) মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে সারাবছর ধরে প্রবাহিত হয়।

➤ উত্তর গোলার্ধে ৭০°- ৮০° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই বায়ু প্রবাহিত হয়।

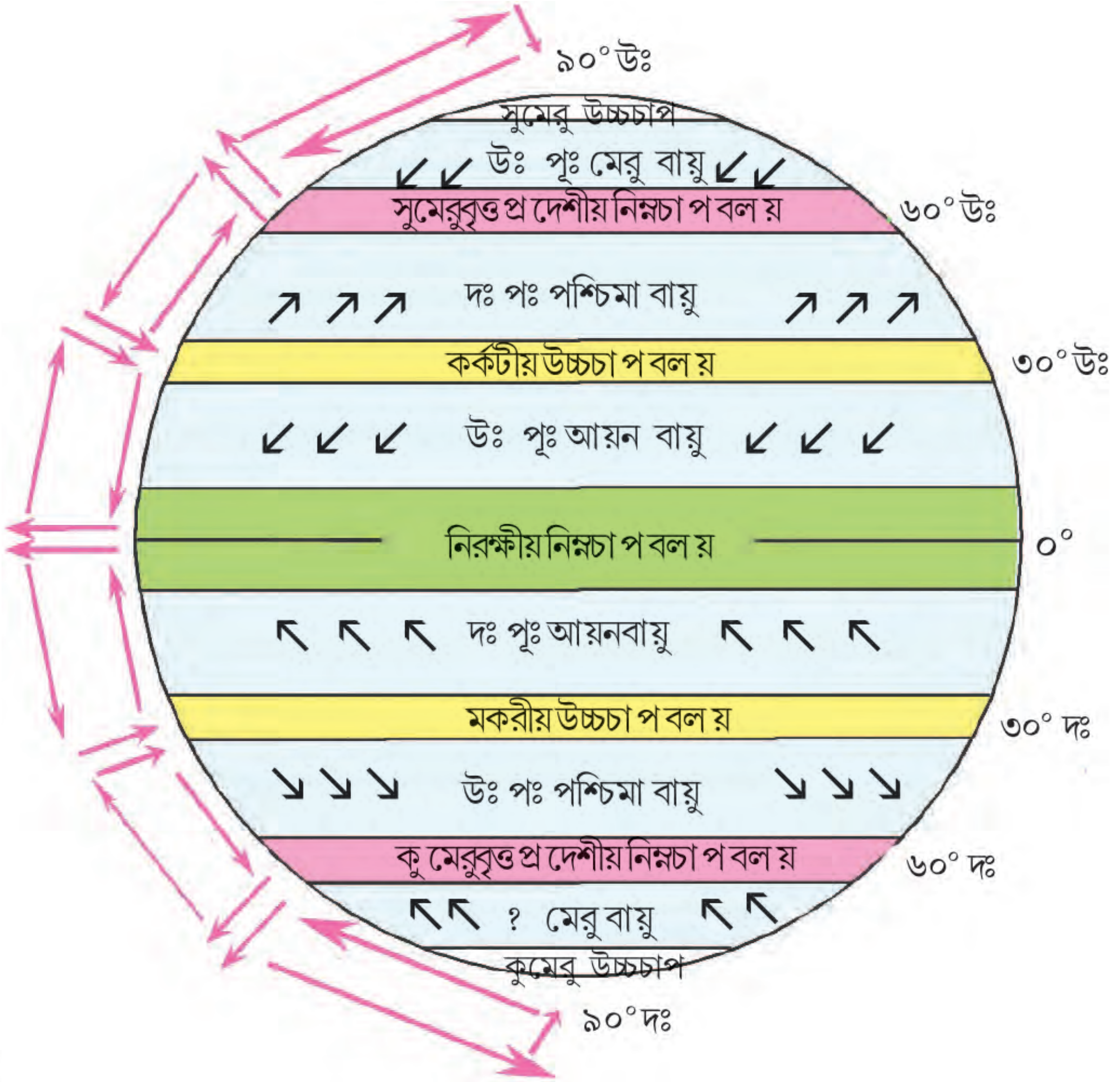

➢ উত্তর গোলার্ধে সুমেরু উচ্চচাপ বলয় থেকে মেরু বায়ু ডানদিকে বেঁকে উত্তর-পূর্ব মেরু বায়ু হিসাবে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে মেরু বায়ু কুমেরু উচ্চচাপ বলয় থেকে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।

➢ মেরুবায়ুর কারণে দুই গোলার্ধে মেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে মাঝে মাঝে তুষারঝড় হয়। যেমন রাশিয়ার সাইবেরিয়া।

- ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ গোলার্ধে মেরু বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং কী নামে পরিচিত?
- মেরু বায়ু শীতল হয় কেন?

পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রবাহিত নিয়তবায়ু

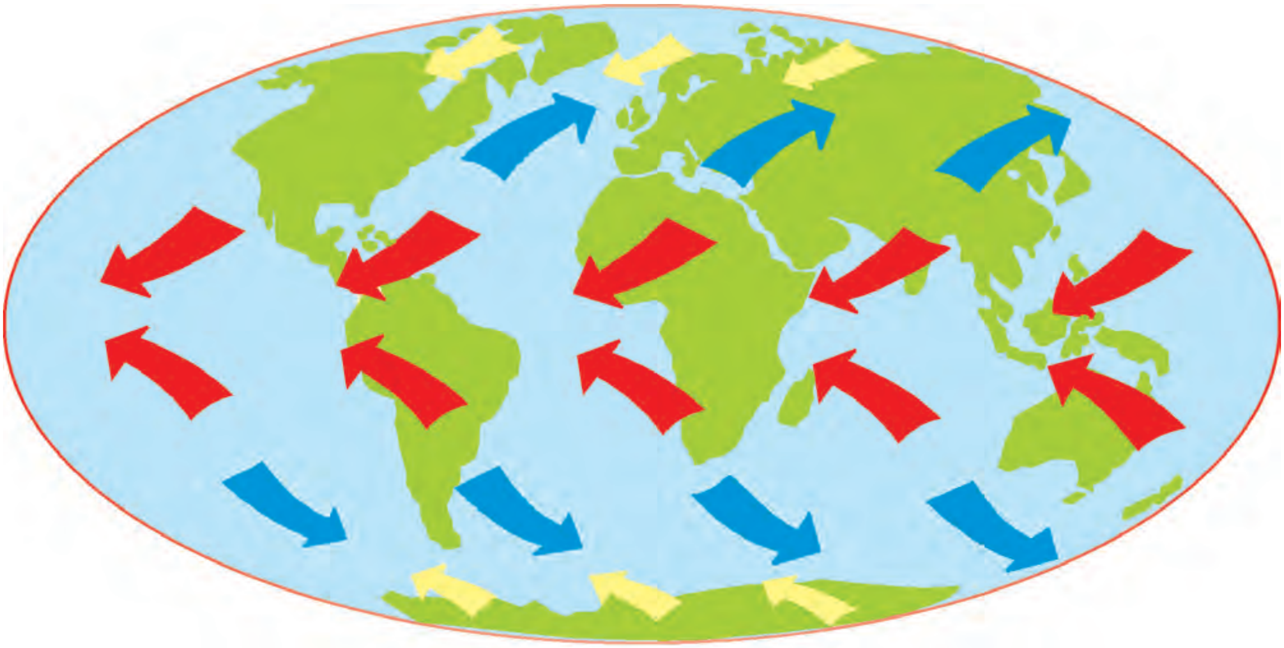

- কোন তিরি চিহ্ন কোন বায়ুর গতিপথকে নির্দেশ করছে তার নাম লিখে ফেলো।

____

____

____

মগজাস্ত্র !

- কোন বায়ুর প্রভাবে এশিয়ার চিন, আফ্রিকার ইথিওপিয়া, উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোতে বৃষ্টিপাত হয় ?
- ভেবে বলোতো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত কোন স্থান 'ক' (নিউইয়র্ক) থেকে অপর একটি স্থান 'খ' (লন্ডন) -তে যেতে প্লেনের পাইলট কোন বায়ুর পথ অনুসরণ করবেন ?

স্থানগুলি কোন গোলার্ধ ও কোন নিয়ত বায়ু প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত লিখে ফেলো —

স্থান	গোলার্ধ	বায়ুর নাম
বাল্টিক সাগর		
জার্মানি		
বলিভিয়া		
কিউবা		
গ্রিনল্যান্ড		
বোফোর্ট সাগর		

● সঠিক বায়ুর নাম লিখে নীচের ফাঁকা জায়গা পূরণ করো। '→' চিহ্ন দিয়ে বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ করো। নীচের নমুনাটি দেখে নাও।

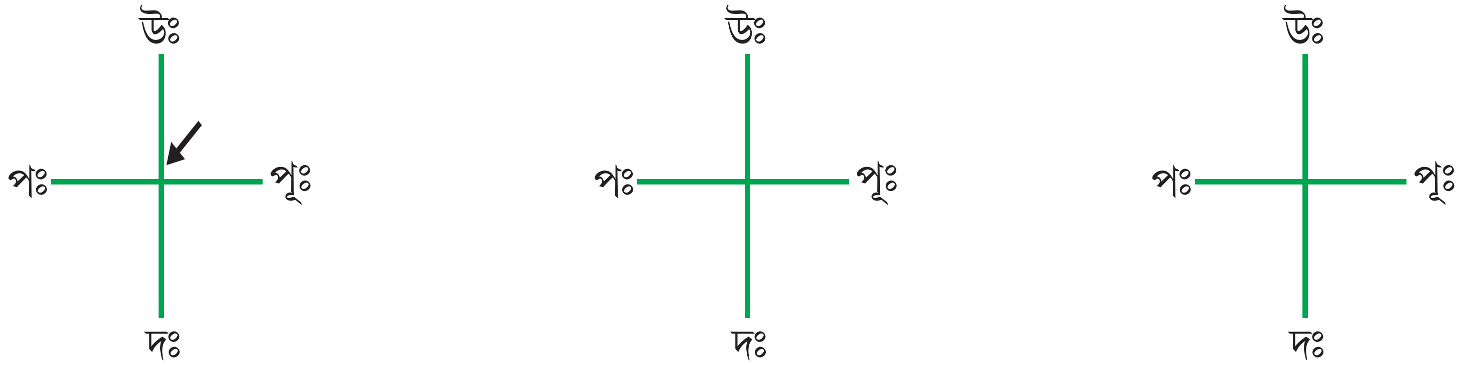

বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন

জলবিষুব ও মহাবিষুবের দিন বায়ুচাপ বলয়গুলো নিজের অবস্থানে থাকে। সূর্যের উত্তরায়ণের এবং দক্ষিণায়নের সময় নিয়ত বায়ুচাপ বলয়গুলো ৫° থেকে ১০° অক্ষরেখা পর্যন্ত যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সরে যায়। একে বলে বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন। কর্কটসংক্রান্তির

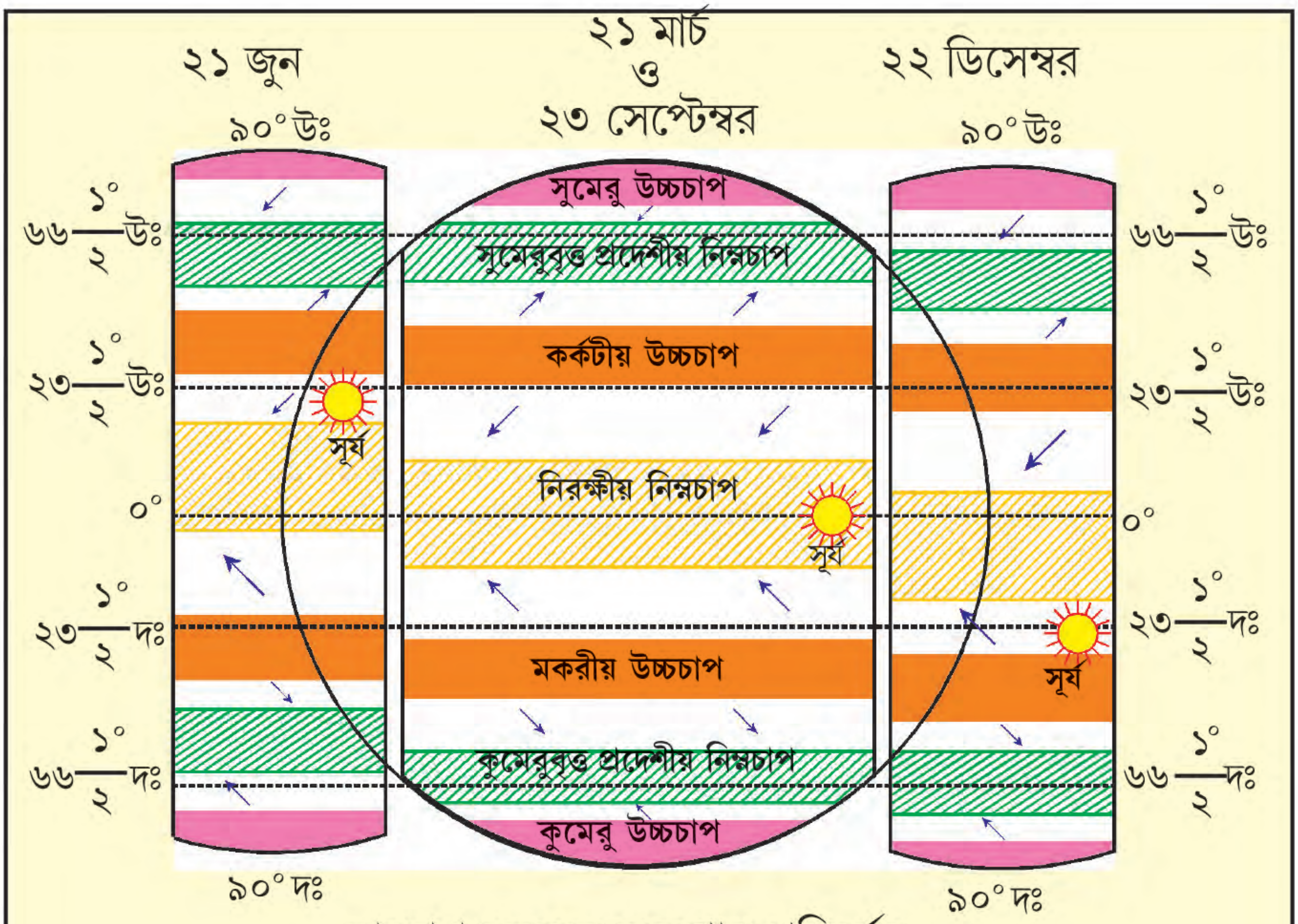

বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন

দিন (২১ জুন) ও মকর সংক্রান্তির দিন (২২ ডিসেম্বর) সূর্যরশ্মি যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি রেখা ও মকরক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে পড়ে।

বায়ুচাপ বলয়গুলোর অবস্থান পরিবর্তন দুই গোলার্ধের ৩০° থেকে ৪০° অক্ষরেখার মাঝের স্থানগুলোর জলবায়ুর ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই অঞ্চলগুলো গ্রীষ্মকালে আয়নবায়ু আবার শীতকালে পশ্চিমা বায়ুর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন সহজ করে বুঝে নাও —

➤ সূর্যের উত্তরায়নের সময় কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয়টি উত্তর দিকে সরে যায়। ফলে গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ থেকে আগত উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে ভূমধ্যসাগরের সন্নিহিত দেশগুলোতে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না।

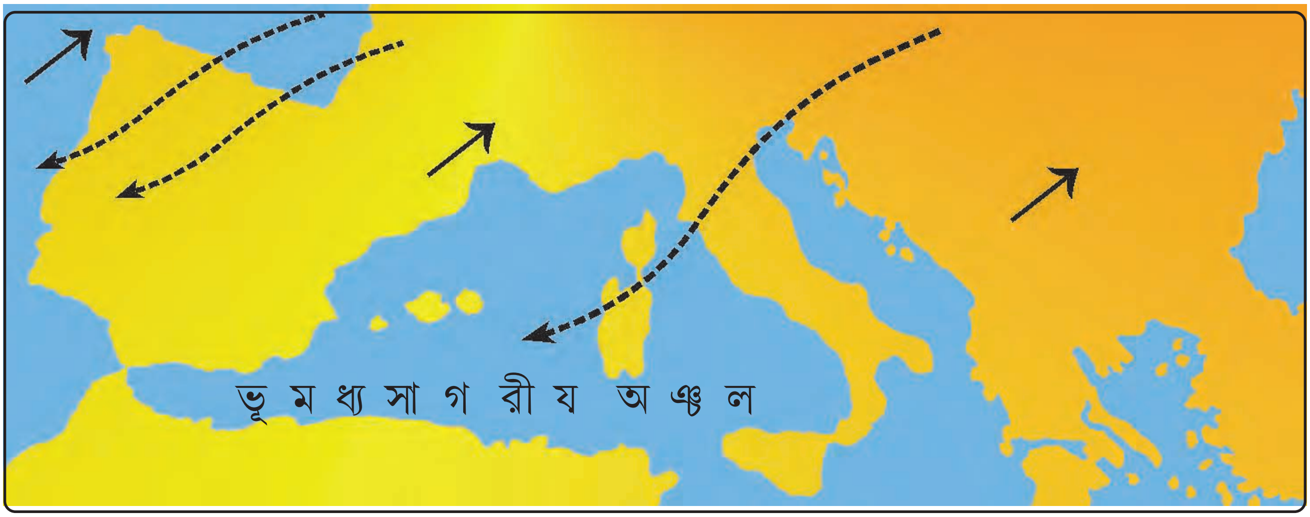

গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুর প্রভাব ----→ আয়ন বায়ু

- আবার সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয়টি দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে শীতকালে এই অংশে জলভাগের ওপর দিয়ে বয়ে আসা দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকালে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাব → পশ্চিমা বায়ু

● পোর্তুগাল, স্পেন, ইতালি ও ফ্রান্সে কোন বায়ুর প্রভাবে কোন ঋতুতে বৃষ্টিপাত হয়?

সাময়িক বায়ু

➤ বছরের একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে কিংবা দিন ও রাতের একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত বায়ু হলো সাময়িক বায়ু (Periodic Wind)। এই বায়ু নিয়ত বায়ুর মতো সারাবছর ধরে নিয়মিতভাবে চলাচল করে না।

বিকেল-সন্ধের দিকে সমুদ্র বা নদীর ধারের আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক হয়। এই সময় সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে ঠান্ডা বাতাস বয়। এই বাতাসই হলো সমুদ্রবায়ু (Sea Breeze)। স্থলভাগ ও জলভাগের ওপরের বায়ুর মধ্যে তাপমাত্রা ও চাপের পার্থক্যই এই বায়ুর উৎপত্তির কারণ। দিনের বেলা সূর্যের তাপ শোষণ করে স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় তাড়াতাড়ি উষ্ণ হয়ে ওঠে। স্থলভাগের ওপরের হালকা বায়ু প্রসারিত হয়ে ওপরে উঠে গেলে সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে সমুদ্রের জল স্থলভাগের তুলনায় শীতল হওয়ায় সেখানকার বাতাসে তুলনামূলক উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে দিনের বেলা সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে অপেক্ষাকৃত শীতল আরামদায়ক সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হয়। সূর্য ওঠার ঘণ্টা চারেক পর থেকেই এই বায়ু বইতে শুরু করে এবং বিকেল-সন্ধের দিকে এর গতিবেগ বেড়ে যায়।

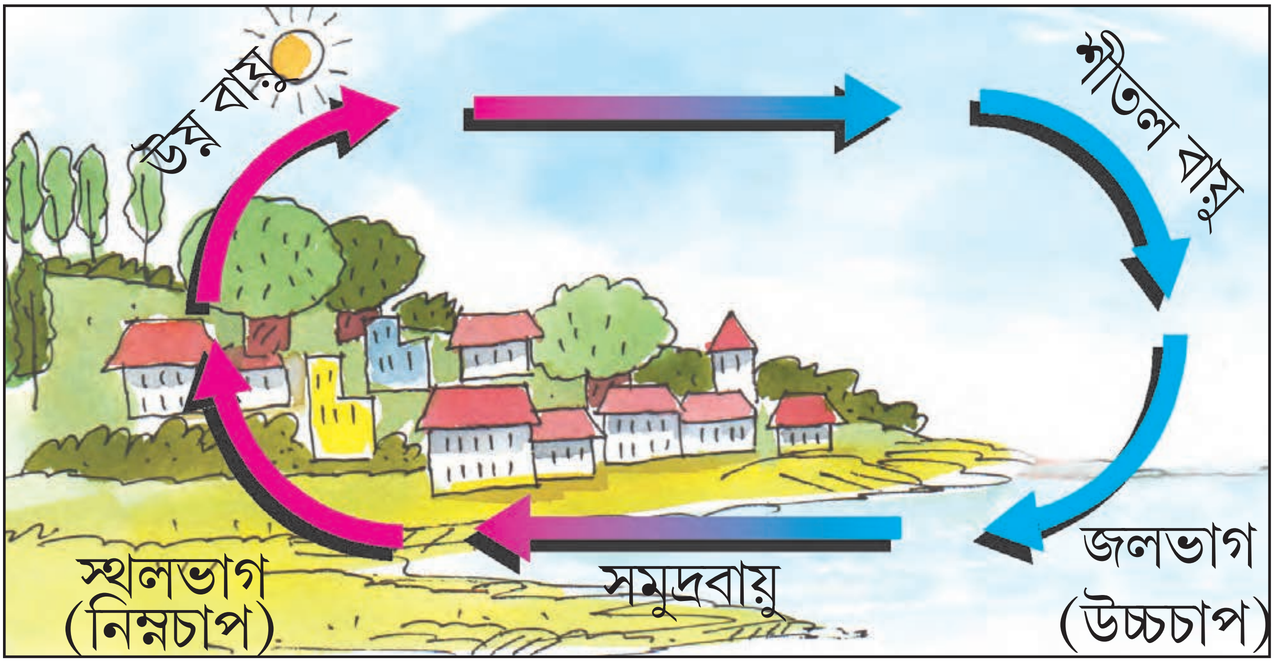

সমুদ্রবায়ু

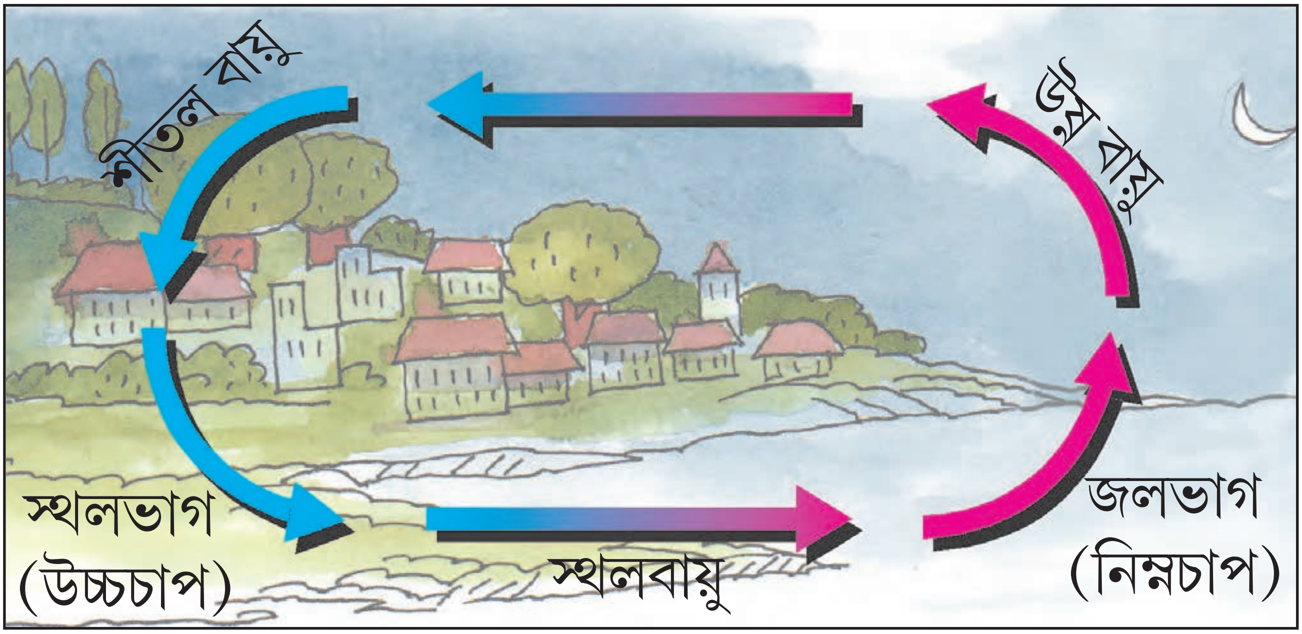

স্থলবায়ু

সূর্যাস্তের পর থেকেই স্থলভাগের ওপরের বায়ু তাপ বিকিরণ করে রাতের দিকে বেশ শীতল হয়ে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রের ওপরের বায়ু তখনও স্থলভাগের তুলনায় বেশি উষ্ণ থাকে। স্থলভাগের ওপর বায়ুর উচ্চচাপ ও সমুদ্রের ওপর বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে রাতের বেলা স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এই বায়ু হলো স্থলবায়ু (Land Breeze)। ভোররাতের দিকে এই বায়ুর গতিবেগ বেড়ে যায়।

সমুদ্রবায়ু - স্থলবায়ুর বিশেষত্ব

- এই বায়ুপ্রবাহ একটি দৈনন্দিন ঘটনা।
- প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রবাহিত হয়।
- সাধারণত এই দুই বায়ুর প্রভাব উপকূল থেকে প্রায় ১৫০ কিমি অঞ্চলের মধ্যে দেখা যায়।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো

- কোন বায়ু উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত ঘটায়?
- ভোরবেলা পালতোলা নৌকা কোন বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রে বা নদীতে চলবে?
- বিকেলের দিকে সমুদ্র বা নদীর পাড়ে বসলে কোন দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইবে?

➢ দৈনিক তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে যেমন সমুদ্র ও স্থলবায়ুর সৃষ্টি হয় তেমনি দুটো বিপরীত ঋতুতে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্যই হলো মৌসুমি বায়ুর সৃষ্টির কারণ। গ্রীষ্মকালকে দিন আর শীতকালকে রাত ধরলে হলে এই দুই ঋতুর পার্থক্যের জন্যই মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। তাই এই বায়ুকে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ বলে।

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলগুলো ভারত মাহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ সূর্যের তাপে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এইসময় ভারত মহাসাগরের জল তুলনায় শীতল থাকায় সেখানকার বায়ুতে উচ্চচাপ তৈরি হয়। ফলে গ্রীষ্মকালে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু হলো গ্রীষ্মকালীন মৌসুমিবায়ু।

গ্রীষ্ম মৌসুমি

শীত মৌসুমি

শীতকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে পড়ে এবং সেখানে বায়ুর উচ্চচাপ তৈরি হয়। এইসময় ভারত মহাসাগরের জল স্থলভাগের তুলনায় উষ্ণ থাকায় সেখানে বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে শীতকালে স্থলভাগ থেকে ঠান্ডা শুষ্ক বাতাস সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু হলো শীতকালীন মৌসুমি বায়ু।

- শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি প্রায় হয় না কেন?

- মৌসুমি বায়ুকে সাময়িক বায়ু বলার কারণ কী?

আমরা জানি উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে উষ্ণতা কমে। তবে পর্বতের উঁচু অংশে অনেক সময় উপত্যকার তুলনায় বেশি জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। কেন এমন হয় জানো?

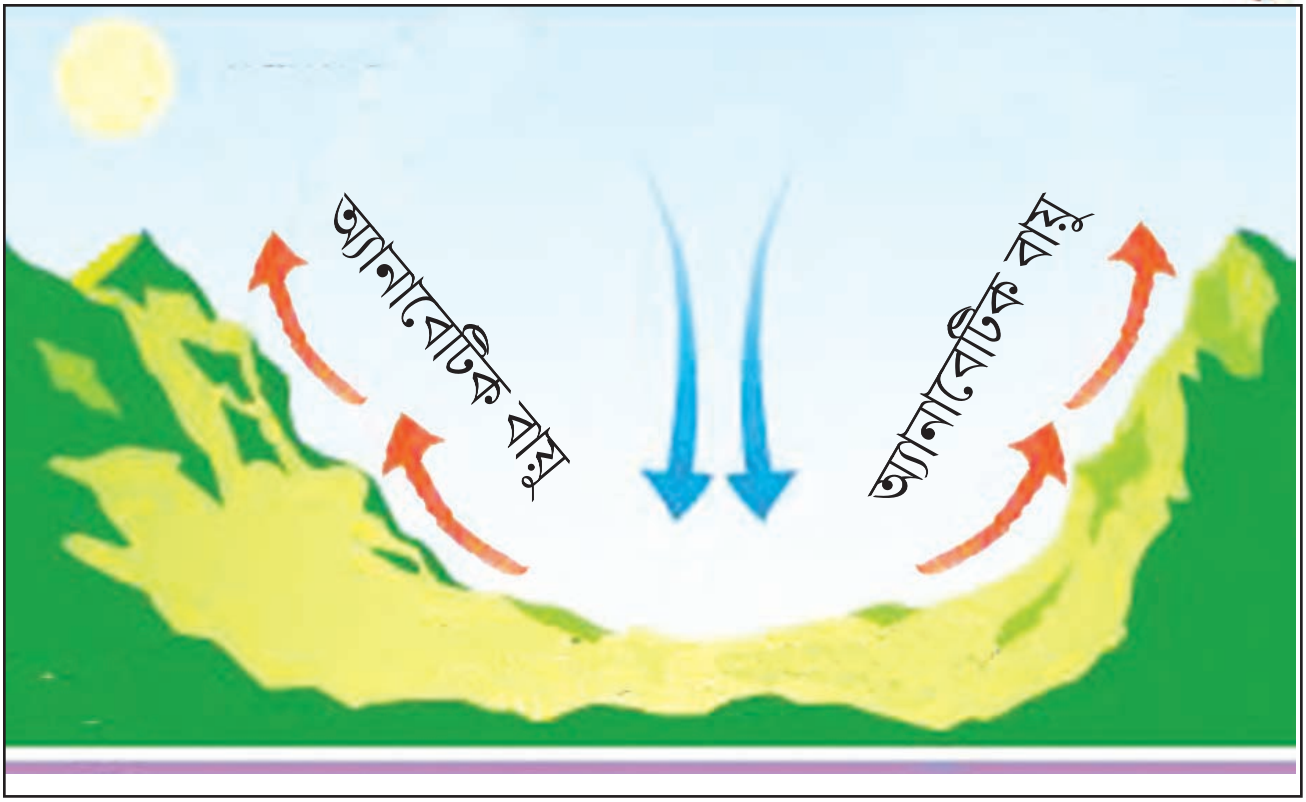

দিনের বেলা সূর্যের তাপে পর্বতের ঢালের ওপরের বায়ু যে পরিমাণ উষ্ণ হয়, উপত্যকার মাঝের অংশের বায়ু ততটা উষ্ণ হয় না। ফলে এই উষ্ণ ও হালকা বায়ু পর্বতের ঢাল বরাবর নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই বায়ু হলো উপত্যকা বায়ু যার আরেক নাম অ্যানাবেটিক বায়ু (Anabatic Wind)। এই সময় উপত্যকায় শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত বায়ু অবস্থান করে।

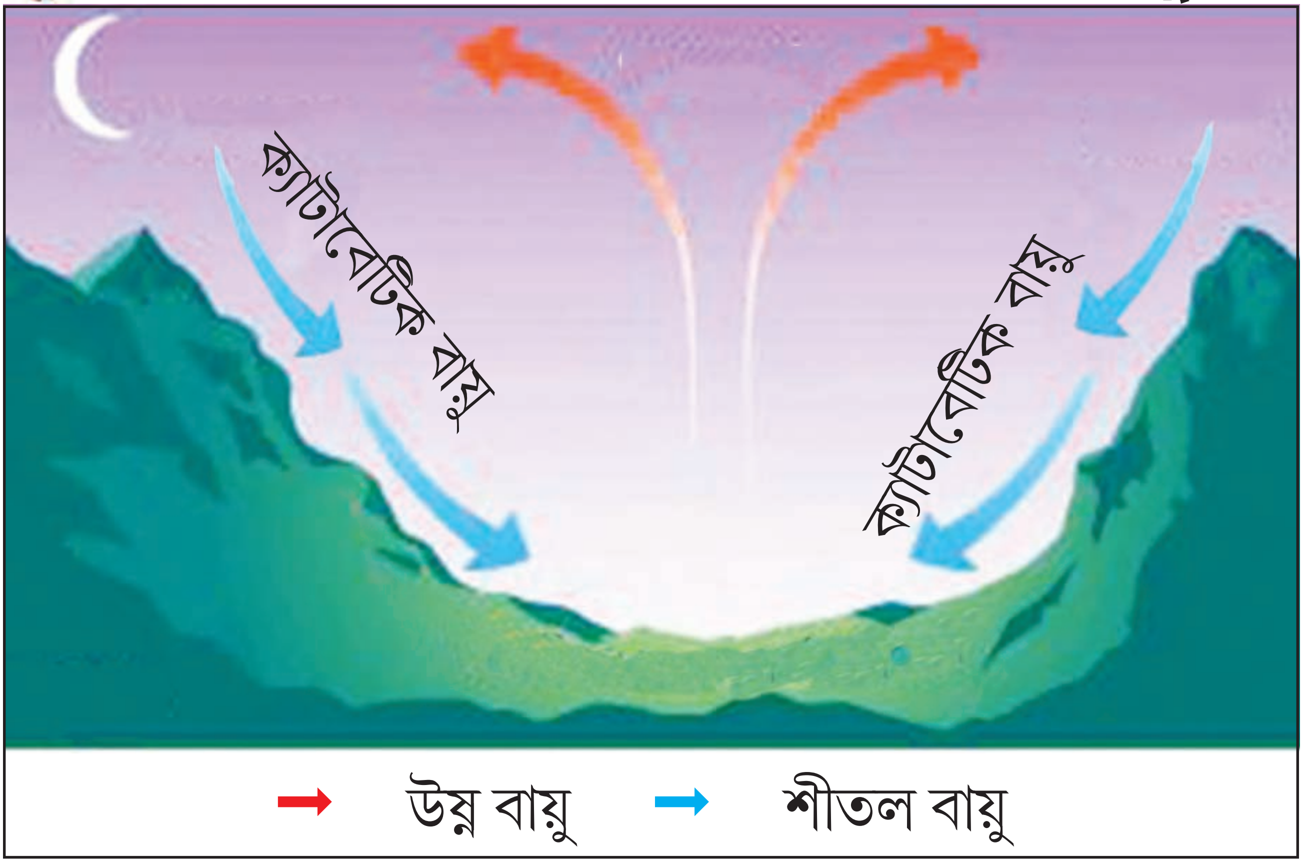

আবার রাত্রিবেলায় তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে পর্বতের ঢালের উপরিস্থিত বায়ু শীতল হয়ে পড়ে। এই উচ্চচাপের ভারী বায়ু পর্বতের ঢাল বরাবর ওপর থেকে নীচের দিকে নামতে শুরু করে এবং উপত্যকায় অবস্থান করে। এই বায়ু হলো পার্বত্য বায়ু যার আরেক নাম ক্যাটাবেটিক বায়ু (Katabatic Wind)।

- হিমাচল প্রদেশের কুলু ও কাংড়া উপত্যকার মাঝের অংশের তুলনায় পর্বতের উঁচু ঢালে জনবসতি কিছুটা বেশি দেখা যায় কেন?

স্থানীয় বায়ু

পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় কারণে প্রবাহিত বায়ু হলো স্থানীয় বায়ু (Local Wind)। যে অঞ্চল থেকে এই বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানকার স্থানীয় ভাষার কোনো নামে এই বায়ু পরিচিত। ভারতে প্রবাহিত স্থানীয় বায়ু হলো লু ও আঁধি। ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত অঞ্চলে পৃথিবীর সবথেকে বেশি সংখ্যক স্থানীয় বায়ুর প্রবাহ এবং প্রভাব দেখা যায়। রকি পার্বত্য অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু চিনুক, আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের শীতল বায়ু বোরো, লিবিয়া মরুভূমির উষ্ণ ও ধুলিপূর্ণ বায়ু সিরক্কো স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ।

আকস্মিক বায়ু

পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্বল্প পরিসর স্থানে চাপের পার্থক্যের কারণে হঠাৎ করে অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত বায়ু হলো আকস্মিক বায়ু (Variable Wind)।

➤ কোনো অল্প পরিসর জায়গায় বায়ুর চাপ হঠাৎ কমে গেলে কেন্দ্রে নিম্নচাপ তৈরি হয় এবং বাইরের দিকে তুলনামূলক উচ্চচাপ থাকে। এই অবস্থায় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবল গতিতে কুন্ডলাকারে পাক খেতে খেতে ছুটে আসে।

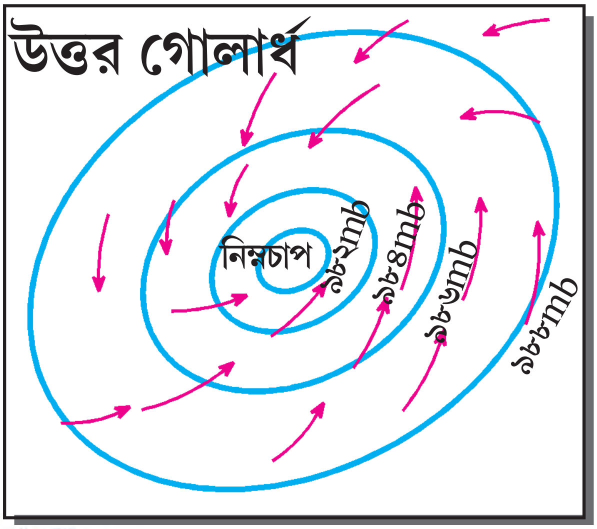

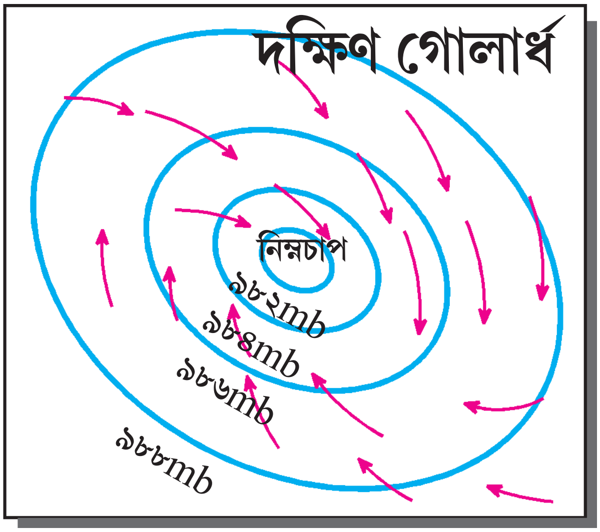

একেই বলে ঘূর্ণবাত (Cyclone)। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবাতের প্রভাবে বায়ুর গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ১৬০ কিমি পর্যন্ত হয়। ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত বিধ্বংসী প্রকৃতির। এর প্রভাবে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের ধ্বংস করার ক্ষমতা তুলনায় অনেকটাই কম। এর প্রভাবে দীর্ঘ সময় ধরে হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়।

➢ কোনো জায়গায় বায়ুর উষ্ণতা হঠাৎ করে কমে গেলে বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। তখন কেন্দ্রে থাকে উচ্চচাপ আর বাইরের দিকে সৃষ্টি হয় নিম্নচাপ। এই অবস্থায় বায়ু কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যায়। যেহেতু

এটি ঘূর্ণবাতের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা, তাই এর নাম প্রতীপ ঘূর্ণবাত (Anti Cyclone)। সাধারণত উচ্চ অক্ষাংশে এই প্রতীপ ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। প্রতীপ ঘূর্ণবাতে বায়ুর গতিবেগ ঘূর্ণবাতের তুলনায় অনেকটাই কম। প্রতীপ ঘূর্ণবাত সাধারণত মেঘমুক্ত, শুষ্ক ও রোদ ঝলমলে আবহাওয়া নির্দেশ করে।

- ওপরের ছবি দুটো দেখে বলো উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতীপ ঘূর্ণবাতের বায়ুর অভিমুখ কোন দিকে?

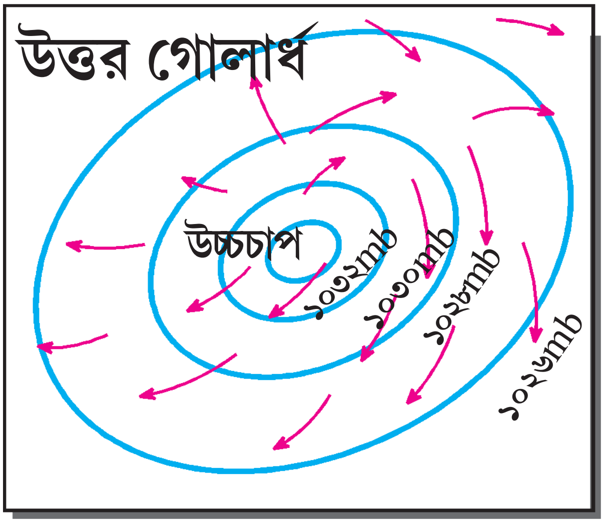

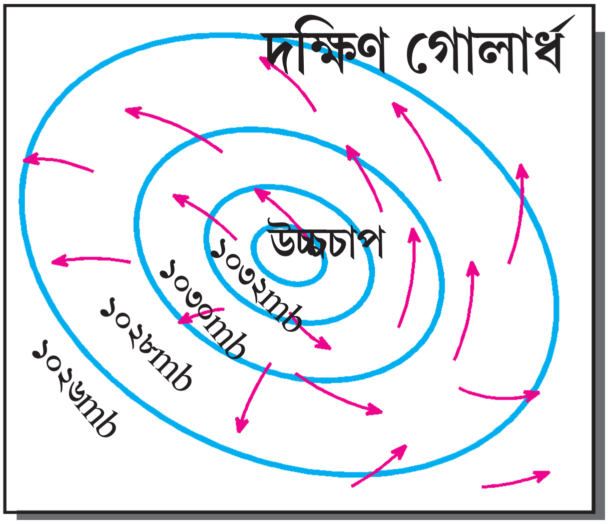

- নীচের ছবি দুটো দেখে বলোতো কোনটা ঘূর্ণবাত আর কোনটা প্রতীপ ঘূর্ণবাতের প্রভাবকে বোঝাচ্ছে?

ঝড়ের ডায়েরি: পিলিন-পথে পাঁচ মূর্তি

গতিবেগ

১৯৯৯
সুপার সাইক্লোন
ওড়িশা
২৬০কিমি/ঘণ্টা

২০০৫
হ্যারিকেন
ক্যাটরিনা
আমেরিকা
২৮০কিমি/ঘণ্টা

২০১৩
সাইক্লোন পিলিন
ওড়িশা
২১৫কিমি/ঘণ্টা

পিছিয়েই যাচ্ছে বর্ষা, সঙ্গে ঠেলা নিম্নচাপ

তামিলনাড়ু-অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে নিম্নচাপের যাওয়ার কথা ছিল আরব সাগরের দিকে

কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা হাওয়ার বাধায় তা চলে আসে অন্ধ্র উপকূলে

ফলে ওড়িশা, বাংলা হয়ে অসম পর্যন্ত তৈরি হয় নিম্নচাপ অক্ষরেখা

মৃত ১০ হাজার, পৃথিবীটা যেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে

ভরা ভাদ্রে কালবৈশাখী, জল থইথই মহানগর

- অক্টোবর মাসেও আকাশে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে! তোমার কি মনে হয় বর্ষার সময়কাল ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে?
- আয়লা, থানে, পিলিন/ফাইলিন, হেলেন, লহর, হাইয়ান--- ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কীভাবে হয় জানার চেষ্টা করো।
- আমাদের রাজ্য বা দেশের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করো।

৫

মেঘ-বৃষ্টি

আজ ছুটির দিন। জানলাটা খুলতেই শরতের আকাশটা চোখে পড়ল ইন্দ্রজিতের। নীল আকাশে মেঘগুলো পেঁজা তুলোর মতো ভাসছে। মেঘের নানারকম নকশা কল্পনা করতে করতে ইন্দ্রজিৎ মাঠের দিকে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হলো আকাশে সবসময় তো একই রকম মেঘ দেখা যায় না! কখনও ঘন কালো মেঘে

সারা আকাশ ঢেকে যায়। আবার কখনও পাতলা চাদরের মতো মেঘ আকাশে দেখা যায়।

মেঘেদের পরিবার

বেশি উচ্চতার মেঘ (গড় নিম্নতম উচ্চতা ২০,০০০ ফুট)

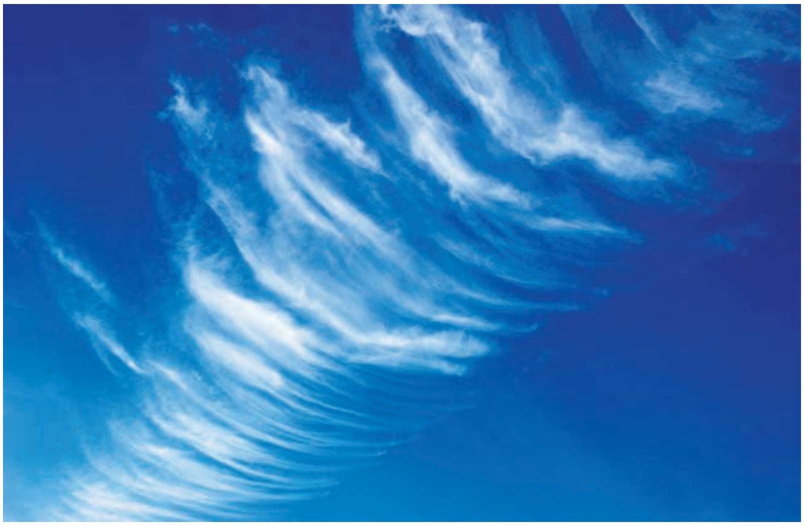

সিরাস

সিরাস--- সাদা রঙের স্বচ্ছ এই মেঘ দেখতে অনেকটা হালকা পালকের মতো। এই মেঘ সাধারণত পরিষ্কার আবহাওয়াকে নির্দেশ করে। সারা আকাশ এই

মেঘে ঢাকা থাকলেও তার মধ্য দিয়ে সূর্যকে দেখা যায়। এরা যখন একে অপরের সাথে মিশে বন্ধনী তৈরি করে, তখন আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ে।

সিরোস্ট্র্যাটাস

সিরোস্ট্র্যাটাস—পাতলা সাদা চাদরের মতো এই মেঘে ঢাকা আকাশ দুধের মতো সাদা দেখায়। অনেক সময় এই মেঘ চাঁদ আর সূর্যের চারপাশে বলয়ের আকারে অবস্থান করে।

সিরোকিউমুলাস

সিরোকিউমুলাস—পেঁজা তুলোর মতো এই মেঘে ঢাকা আকাশ দেখতে অনেকটা ম্যাকারেল মাছের পিঠের মতো। তাই এই

মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলে তাকে ম্যাকারেল আকাশ (Mackerel Sky) বলে। সাধারণত এই মেঘ পরিষ্কার আবহাওয়াকে নির্দেশ করে।

মাঝারি উচ্চতার মেঘ(গড় উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট — ২০,০০০ ফুট)

অল্টোস্ট্র্যাটাস— ধূসর থেকে নীল রঙের এই মেঘ দেখতে অনেকটা তন্তুর মতো। এই মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্যকে অনেকটা অনুজ্জ্বল দেখায়। সাধারণত এই মেঘ একটানা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেয়।

অল্টোস্ট্র্যাটাস

অল্টোকিউমুলাস—

চ্যাপ্টা, গোলাকার, সাদা থেকে ধূসর রঙের এই মেঘ আকাশে ঢেউ-এর মতো অবস্থান করে। এর ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ দেখা যায়।

অল্টোকিউমুলাস

নিম্ন উচ্চতার মেঘ (গড় সর্বোচ্চ উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট)

স্ট্র্যাটোকিউমুলাস

স্ট্র্যাটোকিউমুলাস —

এই মেঘ দেখতে অনেকটা স্তূপের মতো ও স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। অনেক সময় দেখে মনে হয় স্তরগুলো যেন গড়িয়ে চলেছে। তাই এর আরেক নাম Bumpy Cloud।

স্ট্র্যাটাস

স্ট্র্যাটাস— সাদা থেকে ধূসর রঙের এই মেঘ সারা আকাশকে কুয়াশার মতো ঢেকে রাখে। পাহাড়ে উঁচু অংশে এই মেঘ জমলে পর্বতারোহী ও বিমান চালকদের পক্ষে খুব অসুবিধা হয়। এই মেঘে মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়।

নিম্বোস্ট্র্যাটাস

নিম্বোস্ট্র্যাটাস— ঘন, পুরু, ধূসর থেকে কালো রঙের এই মেঘ খারাপ আবহাওয়াকে নির্দেশ করে। এই মেঘের কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না, একটানা বৃষ্টিপাত হয়।

উল্লম্ব মেঘ (গড় নিম্নতম উচ্চতা ১, ৬০০ ফুট)

কিউমুলাস — পুরু, ঘন এই মেঘের উল্লম্ব বিস্তার দেখা যায়। উপরিভাগের আকার অনেকটা ফুলকপির মতো হলেও তলদেশ সমতল। এই মেঘের শীর্ষদেশ বেশ উঁচু, নিম্নাংশের রং কালো হলেও উপরিভাগের রং সাদা। সাধারণত পরিষ্কার আবহাওয়া নির্দেশ করে।

কিউমুলোনিম্বাস

কিউমুলোনিম্বাস --- অনেকটা গম্বুজের মতো দেখতে এই মেঘ সাদা-ধূসর ও কালো রঙের হয়। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর থেকে প্রায় ১২০০০ ফুট পর্যন্ত এই মেঘের উল্লম্ব বিস্তার দেখা যায়।

ওপরদিক চ্যাপ্টা ও তলদেশ প্রায় সমতল। কিউমুলোনিম্বাস মেঘে বজ্রপাতসহ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়। তাই এর আরেক নাম বজ্রমেঘ (Thunder Cloud)। অনেকসময় এই মেঘ থেকে শিলাবৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

একনজরে মেঘেদের পুরো পরিবার

- **মেঘের সঙ্গে আলাপচারিতা :** যে সব মেঘেদের কথা তোমরা জানলে তাদের আকাশে কবে দেখতে পেলে, তারিখ দিয়ে খাতায় লিখে রাখো।

মেঘের সৃষ্টি

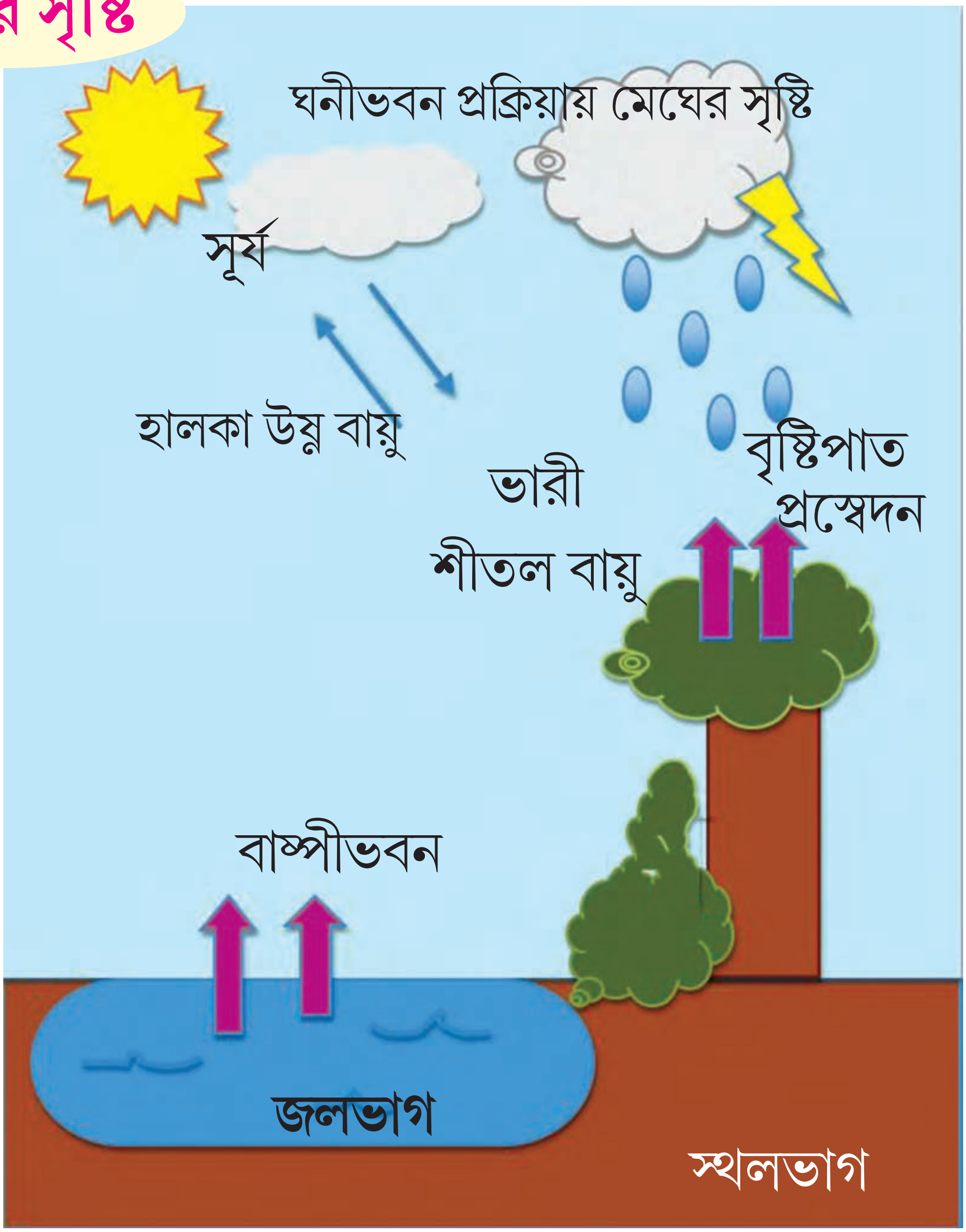

সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, পুকুরের জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুতে মেশে। এছাড়াও গাছপালার প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলীয়বাষ্প বাতাসে যুক্ত হয়। এই জলীয়বাষ্পযুক্ত বায়ু সাধারণ বায়ু অপেক্ষা হালকা হয় এবং সহজে ওপরের দিকে উঠে প্রসারিত হয়। ওপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে এই জলীয়বাষ্পযুক্ত বাতাস তাড়াতাড়ি শীতল হয়। বায়ু যত শীতল হয় তার জলীয়বাষ্প ধারন ক্ষমতা তত কমে যায়। ধীরে ধীরে ঐ আর্দ্র বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কে এসে পৌঁছায় এবং বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই সম্পৃক্ত বায়ু আরো শীতল হলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছোটো ছোটো জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণা বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা, লবণকণা, নানাধরনের কঠিন কণিকাকে অবলম্বন করে মেঘ হিসাবে ভেসে বেড়ায়। সাধারণত মেঘের

জলকণাগুলোর ব্যাস হয় ০.০২ মিমি। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারেই মেঘের সৃষ্টি হয়।

হাতে- কলমে

- একটা কেটলি বা পাত্রে জল নিয়ে গ্যাস বা উনুনের ওপর বসানোর কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে কেটলি বা পাত্রটার মুখ দিয়ে সাদা রঙের ধোঁয়া বের হচ্ছে।

এই ধোঁয়া আসলে কী?

- একটা গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ রাখো। কিছুক্ষণ বাদে দেখবে গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা দেখা যাচ্ছে বা গ্লাসটা ধরলে হাতে জল লাগছে। কারণ গ্লাসের চারপাশের বাতাস ঠান্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে ওঠে এবং জলীয়বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হয়।

এই ঘটনা কোন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে?

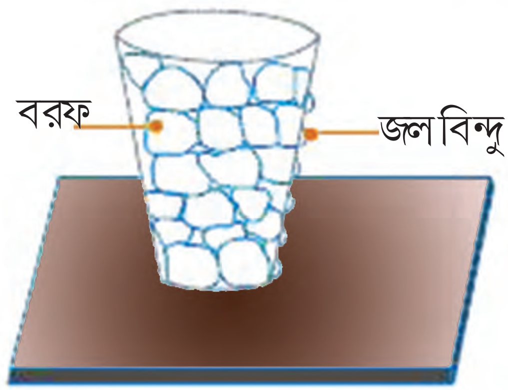

পাশের ছবির মতো একটা কাঁচের প্লেট ও জারের মধ্যে সমপরিমাণ জল নিয়ে খোলা জায়গায় রাখো। দু-তিন দিন বাদে জলের পরিমাণগত কী পার্থক্য দেখা যাবে এবং কেন?

বিশেষ কথা

- জলের বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো **বাষ্পীভবন**।
- কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু যতটা পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকলে ওই বায়ু **সম্পৃক্তবায়ু**।
- যে তাপমাত্রায় বায়ু সম্পৃক্ত হয় তাই হলো ওই বায়ুর **শিশিরাঙ্ক**।
- জলীয়বাষ্পের জলকণায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো **ঘনীভবন**।

নিজের হাতে তৈরি মেঘ!

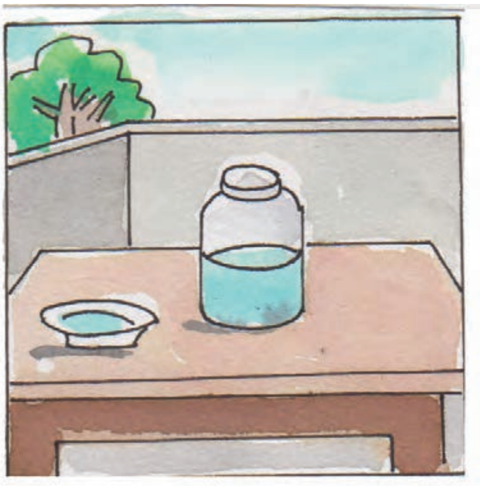

বানাতে লাগবে— এক লিটারের প্লাস্টিকের বোতল, ফোটানো নয় এমন গরম জল, দেশলাই।

- বোতলে এমন ভাবে গরম জল ঢালো যাতে বোতলটির তলার অংশ জলপূর্ণ থাকে।
- একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এবং লক্ষ রাখো যাতে পুরো বোতলটা ধোঁয়ায় ভরে যায়।

- এবার বোতলের মুখটা বন্ধ করে দাও।
- বোতলটাকে হাত দিয়ে বেশ কয়েকবার চাপ দাও।

চাপ ছেড়ে দিলে দেখা যাবে বোতলের মধ্যে তুমিই তৈরি করে ফেলেছ মেঘ!

অধঃক্ষেপণ

➤ পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে বায়ুমণ্ডল থেকে জলকণা বা বরফকণা (তরল বা কঠিন অবস্থায়) ভূপৃষ্ঠে নেমে এলে তাকে বলে অধঃক্ষেপণ (Precipitation)।

পরিচলন বৃষ্টিপাত

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত অধঃক্ষেপন হলো বৃষ্টিপাত। আকাশে ভেসে থাকা মেঘ হলো আসলে

ধূলিকণাকে আশ্রয় করে থাকা অসংখ্য ছোটো ছোটো জলকণার সমষ্টি। এই মেঘ ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে ও আরো ঘনীভূত হয়। এভাবে ছোটো ছোটো জলকণাগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে বড়ো জলকণায় পরিণত হয়। তুলনায় বড়ো জলকণাগুলো বেশি ভারী হওয়ায় বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না। তখন পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে দুটো প্রক্রিয়া একসাথে কাজ করে—

- বাতাসের শীতল হাওয়া
- বাতাসে জলীয়বাষ্প যুক্ত হওয়া।

ভেবে বলো

- শীতল বায়ু থেকে কেন বৃষ্টিপাত হয়?
- সব মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না কেন?

বৃষ্টিপাতের রকমভেদ

যেসমস্ত অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সারাবছর প্রায় লম্বভাবে পড়ে এবং যেখানে জলভাগের বিস্তার বেশি সেখানে

বাষ্পীভবনের পরিমাণ বেশি হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প মেশে এবং এই উষ্ণ হালকা বাতাস ওপরের দিকে উঠে প্রসারিত হয়। ঊর্ধ্বগামী বায়ুর চাপ কম হওয়ায় উষ্ণতাও কমে যায়। কিন্তু সেই উষ্ণতায় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ একই থাকে। ঠান্ডা বাতাস কম জলীয়বাষ্প ধারন করতে পারে বলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) বেড়ে যায়। ক্রমশ বায়ু আরও শীতল হয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প ছোটো ছোটো জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণা ধূলিকণাকে আশ্রয় করে তৈরি করে মেঘ (সাধারণত কিউমুলোনিম্বাস)। অবশেষে এই মেঘ আরও ঘনীভূত হলে জলকণাগুলো জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে বৃষ্টি রূপে ভূ পৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। —এই বৃষ্টি হলো পরিচলন বৃষ্টিপাত (Convectional Rainfall)। নিরক্ষীয় অঞ্চলে দুপুরের পর বা

বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ মুষলধারে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত অল্প জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

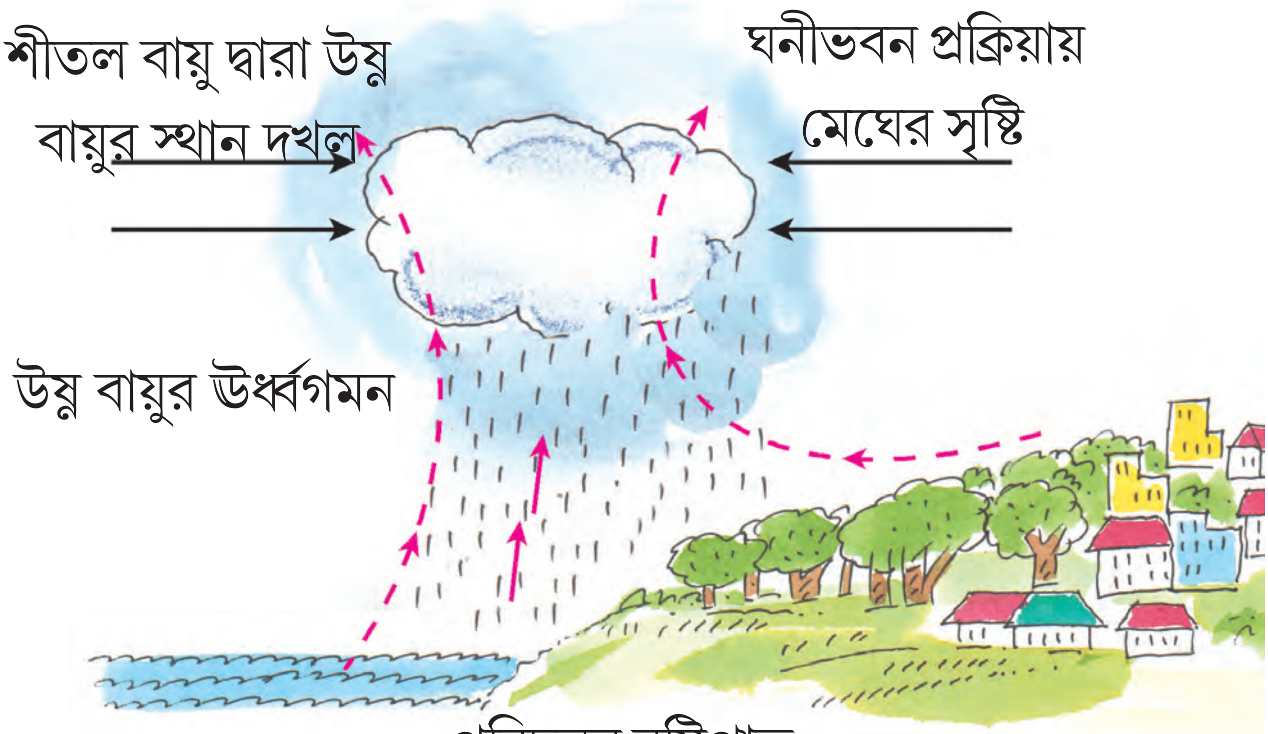

পরিচলন বৃষ্টিপাত

বিশেষ কথা

কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে এবং সেই উষ্ণতায় ঐ বায়ুকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প প্রয়োজন—এই

দুই-এর অনুপাতই হলো **আপেক্ষিক আর্দ্রতা**। এই আর্দ্রতা শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

- ভেবে বলোতো আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে উষ্ণতার সম্পর্ক কীরকম?
- কোনো স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০ শতাংশ বলতে কীবোঝায়?

উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো

- পরিচলন বৃষ্টিপাতে কোন পদ্ধতিতে বায়ু উত্তপ্ত হয়?
- নিরক্ষীয় অঞ্চলে চিরহরিৎ গাছের অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে কেন?
- এমন দুটো দেশের নাম করো যেখানে প্রায় সারা বছর পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়?

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

সমুদ্রের দিক থেকে আসা জলীয়বাষ্পযুক্ত আর্দ্র বায়ুর প্রবাহ পথে আড়াআড়ি ভাবে কোনো পর্বত বা উচ্চভূমি অবস্থান করলে ঐ বায়ু পর্বত বা উচ্চভূমিতে বাধা পেয়ে ঐ পর্বত বা উচ্চভূমির ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। ঊর্ধ্বগামী এই বায়ু ক্রমশ প্রসারিত হয় ও ঠান্ডা হয়। আরও ওপরে উঠলে এই বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে

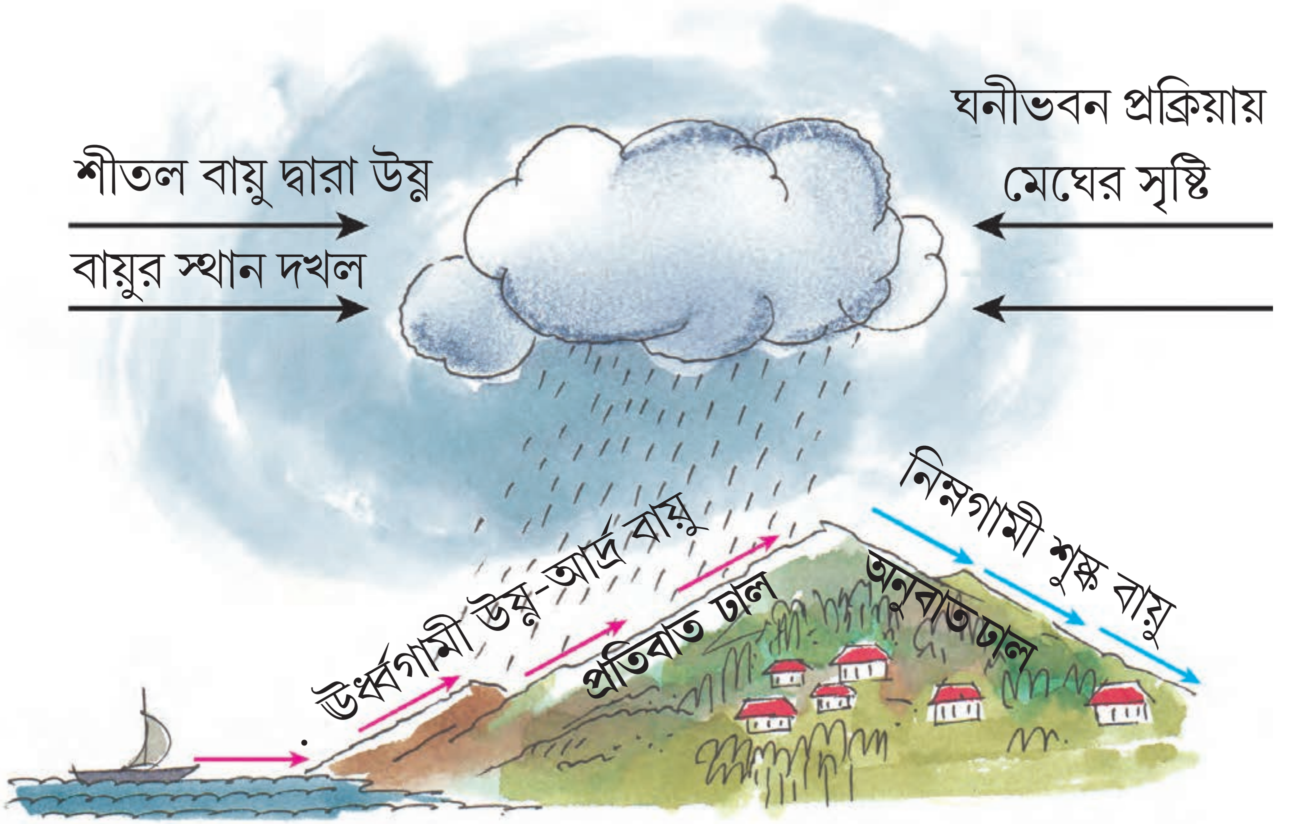

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

পড়ে এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বৃষ্টি হলো শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত (Orographic Rainfall)। পর্বতের যে ঢাল বরাবর বায়ু ওপরের দিকে ওঠে ও বৃষ্টিপাত ঘটায় সেই ঢাল হলো প্রতিবাত ঢাল (Windward Slope)। আর এর বিপরীতে যে ঢাল বরাবর বায়ু নীচের দিকে নামে, সেই ঢাল হলো অনুবাত ঢাল (Leeward Slope)।

প্রতিবাত ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটানোর পর বায়ু যখন পর্বতের অনুবাত ঢালে পৌঁছায় তখন সেই বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। এছাড়া বায়ু যত নীচের দিকে ঢালের উষ্ণতর স্থানে নামতে শুরু করে বায়ুর উষ্ণতা তত বাড়তে থাকে। ফলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ু অসম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে অনুবাত ঢালে প্রতিবাত ঢাল অপেক্ষা বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। তাই পর্বতের অনুবাত ঢাল

বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rainshadow Region) নামে পরিচিত।

নামের বিশেষত্ব

'শৈল' কথার অর্থ পর্বত আর 'উৎক্ষেপ' হলো ওপরে ওঠা। পর্বত দ্বারা বাধা পেয়ে বায়ু উৎক্ষিপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত হওয়ায় এই বৃষ্টির নাম শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত।

- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আরব সাগরীয় শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পেয়ে পর্বতের পশ্চিমঢালে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পর্বতের পূর্বঢালে অবস্থিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশবিশেষ কম বৃষ্টিপাতের কারণে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

● উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি আর উত্তর ঢালে অবস্থিত শিলং -এর মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৫৬ কিমি। চেরাপুঞ্জিতে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১১, ৭৭৭মিমি। কিন্তু শিলং -এর বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২,২০৭মিমি।

● চেরাপুঞ্জি ও শিলং — এর মধ্যে দূরত্ব এত কম হওয়া সত্ত্বেও দুটো জায়গার মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণগত তারতম্য হয় কেন?

● মৌসুমি বায়ুর কোন শাখার প্রভাবে চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন?

● মুম্বইয়ের তুলনায় পুনেতে বৃষ্টিপাত কম হয় কেন?

ঘূর্ণ বৃষ্টিপাত

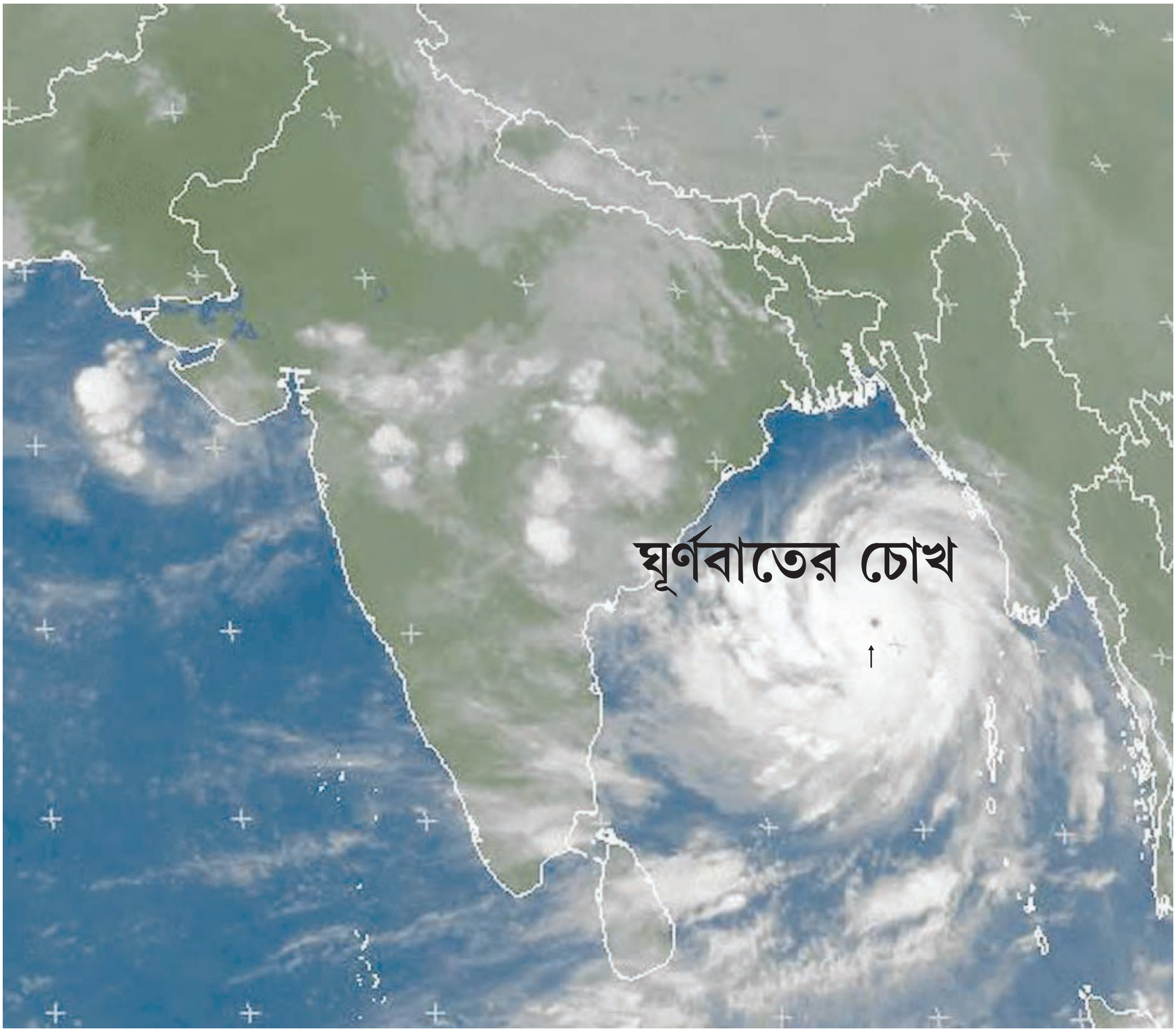

ঘূর্ণবাত ফাইলিনের উপগ্রহ চিত্র

স্বল্প পরিসর কোনো স্থানে উয়্নতা বেড়ে গেলে সেখানকার বায়ু গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। ফলে সেখানে

বায়ুর চাপ কমে গিয়ে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপের চারিদিকে বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায় বায়ুর চাপ তুলনায় বেশি থাকে। উচ্চচাপের এই বায়ু প্রবল গতিতে নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে কুন্ডলাকারে ছুটে আসায় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত তৈরি হয়। কেন্দ্রে প্রবেশের পর এই বায়ু উষ্ণ হয় এবং ঘুরতে ঘুরতে ওপরের দিকে ওঠে। এই কেন্দ্রাভিমুখী ঊর্ধ্বগামী বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই ঘূর্ণবাত থেকে সৃষ্ট বৃষ্টিপাতের নাম ঘূর্ণবৃষ্টি (Cyclonic Rainfall)।

➤ সাধারণত ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি হয় দুই গোলার্ধের ৫°-২০° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে বায়ুর চাপ সব থেকে কম থাকে, এই অংশের নাম ঘূর্ণবাতের চোখ (Eye of Cyclone)। সাধারণত ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং

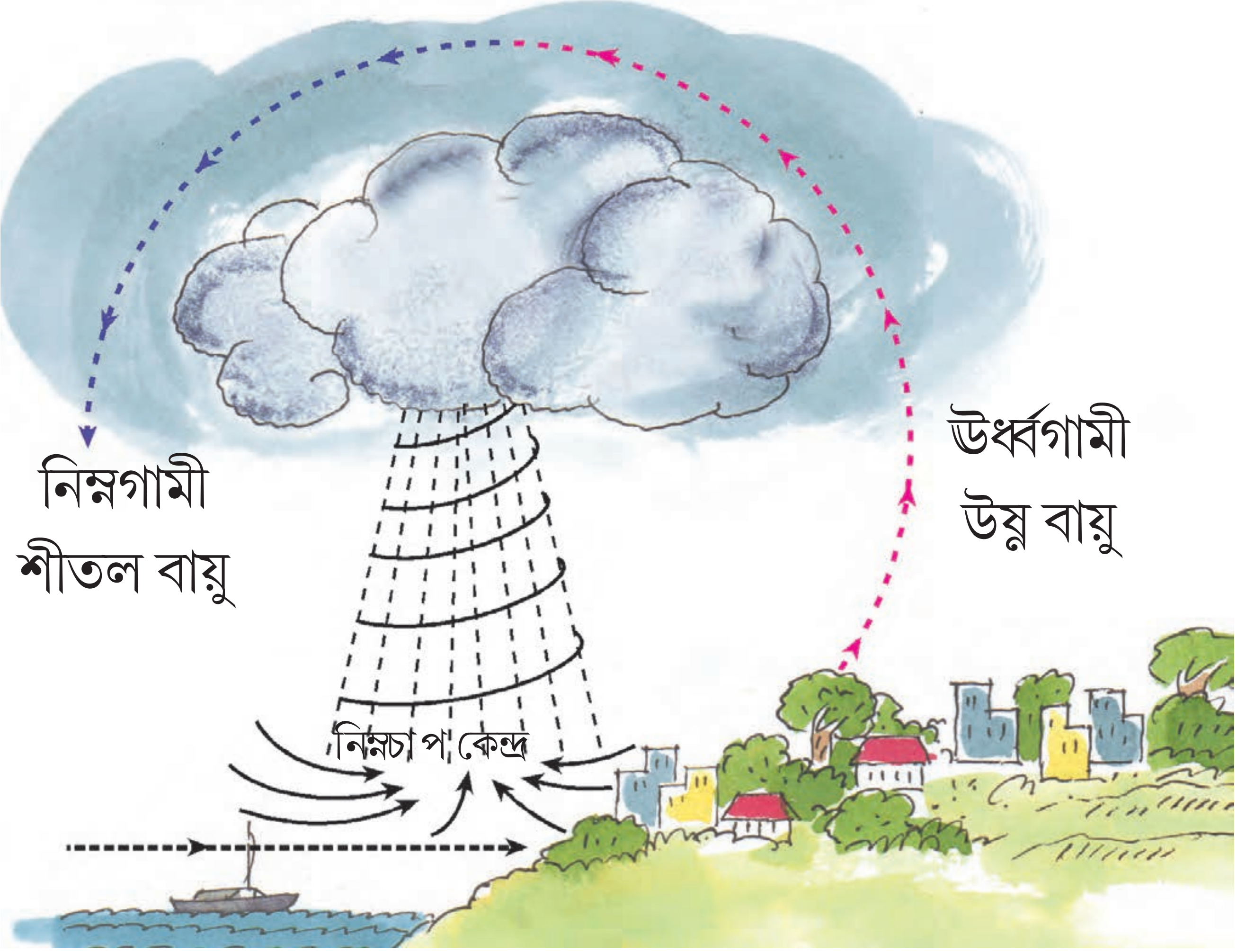

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টি

শান্ত আবহাওয়া দেখা যায়। এই ঘূর্ণবাত জলভাগের ওপর বেশি শক্তিশালী হয়, যত স্থলভাগের দিকে এগোয় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণত শরৎকালে এই ঘূর্ণবাতের প্রকোপ দেখা যায়।

বঙোপসাগরে সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণবাত ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর ঘূর্ণবৃষ্টি ঘটায়। ২০০৯ সালের ঘূর্ণবাত '**আয়লা**', ২০১৩ সালের ঘূর্ণবাত '**ফাইলিন**'— এর প্রভাবে ভারতের পূর্ব উপকূল তথা বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

➤ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। বঙোপসাগরে সাইক্লোন, ক্যারিবিয়ান সাগরে হ্যারিকেন আবার পূর্ব চিন সাগরে ঘূর্ণিঝড় টাইফুন নামে পরিচিত।

- উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু যেখানে মিলিত হয় সেখানে এই ঘূর্ণবৃষ্টি হতে দেখা যায়।

- মৌসুমি বায়ু অধ্যুষিত দেশগুলোতে শরৎ আর হেমন্তকালে এই বৃষ্টি হয়।

- মধ্য ইউরোপের দেশগুলোতে শীতকালে এই ঘূর্ণবৃষ্টি হতে দেখা যায়।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ঘূর্ণবাত

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কোনো স্থানে নিম্নচাপ তৈরি হলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলীয়বাষ্পযুক্ত উষ্ণবায়ু এবং মেরু

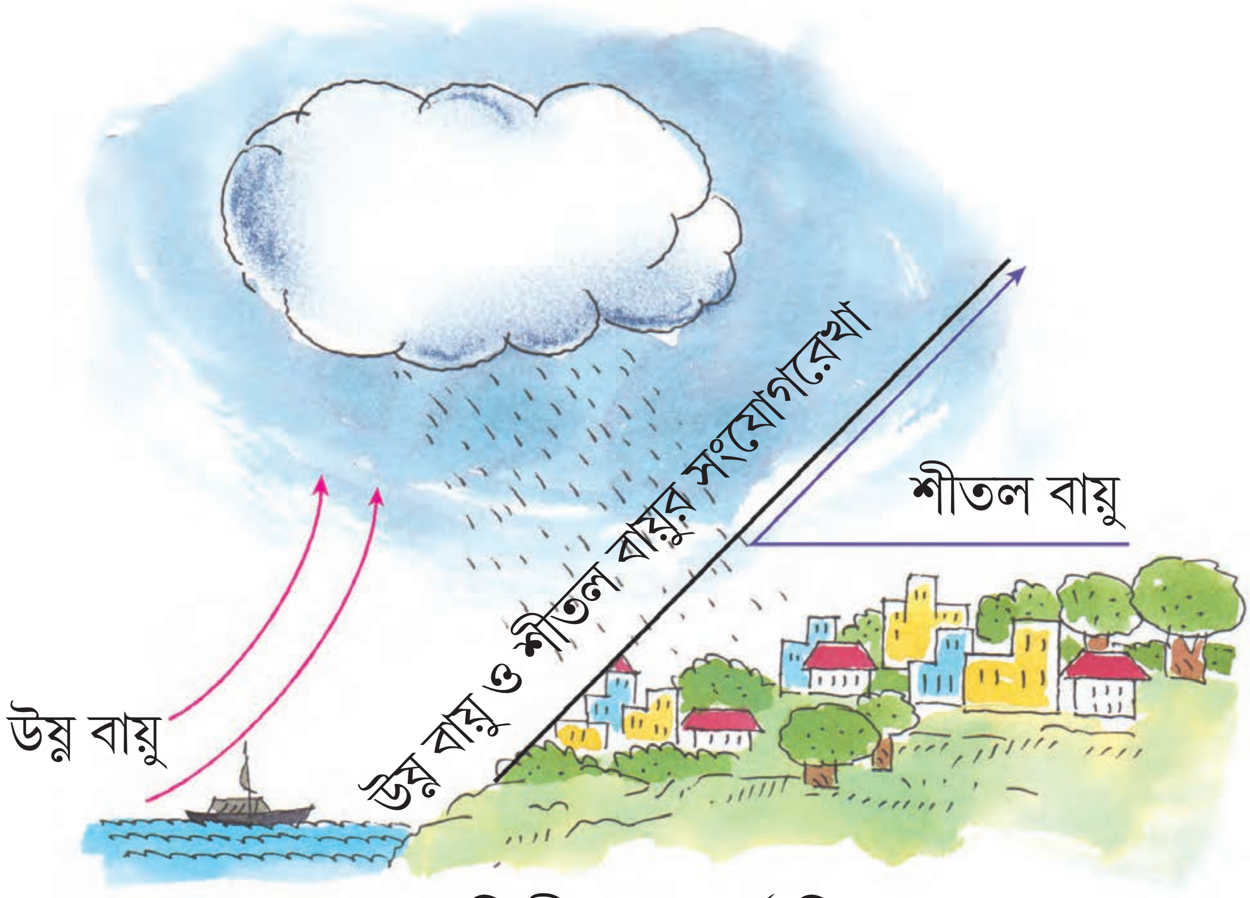

নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টি

অঞ্চলের শীতল শুষ্ক বায়ু ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অনুভূমিক ভাবে ছুটে আসে। দুই বায়ু পরস্পর মুখোমুখি হলে তাদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। উষ্ণ বায়ু হালকা হওয়ায় ভারী শীতল বায়ুর ওপর ধীরে ধীরে উঠে যায়। এই উষ্ণ বায়ু জলীয়বাষ্পযুক্ত হওয়ায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টিতে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মতো ঝড়ঝঞ্ঝা হয় না, ঝিরঝিরে বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চলে।

- শীতকালে এই ধরনের বৃষ্টিপাত মধ্য অক্ষাংশের দেশগুলোতে হয়।

জানার চেষ্টা করো

- শরৎকালে পশ্চিমবঙ্গে কোন ঘূর্ণিঝড় হয় ?
- তোমার অঞ্চলে কোন ঋতুতে কী ধরনের বৃষ্টিপাত হয় সেগুলো সম্বন্ধে লেখো।
- আমাদের দেশে বর্ষাকালে সাধারণত কোন ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে?

আরো কয়েকপ্রকার অধঃক্ষেপণ—

শিলাবৃষ্টি

- খুব ছোটো জলকণা (০.৫ মিমি-এর কম ব্যাসযুক্ত) ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়লে তাকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি (Drizzle) বলে।
- জলকণা ও তুষার কণার আংশিক মিশ্রিত রূপ হলো স্লিট (Sleet)।
- ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর প্রভাবে অনেক সময় জলকণাগুলো অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সেখানে জলকণাগুলো দ্রুত ঠান্ডা হয়ে বরফের টুকরোতে পরিণত হয়। বরফের

টুকরো বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সাথে ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। একেই বলে **শিলাবৃষ্টি (Hailstorm)**। শিলাবৃষ্টিতে ঘর-বাড়ি এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হতে দেখা যায়।

- সাধারণত শীতপ্রধান দেশে এবং উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে জলীয়বাষ্পযুক্ত বায়ু হিমাঙ্কের থেকে কম উষ্ণতায় ঘনীভূত হলে জলকণার বদলে সরাসরি বরফ কণায় বা তুষারে পরিণত হয়। এই তুষার মাধ্যাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠে ঝড়ে পড়লে তাকে বলে **তুষারপাত (Snowfall)**।

তুষারপাত

জেনে রাখো

শিশির

শীতের রাতে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত তাপ বিকিরণ করলে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর শীতল হয়ে পড়ে। ফলে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন জলীয়বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হয়ে ছোটো ছোটো জলবিন্দু তৈরি করে। এগুলো হলো **শিশির**। ঘাস, গাছের পাতা, ঘরের চালা ইত্যাদির ওপর শিশির জমা হয়। মেঘমুক্ত রাতে শিশির বেশি সৃষ্টি হয়।

- শীতকালে ভোরবেলায় ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটলে পা ভিজে যায় কেন?
- শুষ্ক অঞ্চলে শিশির কম পড়ে কেন?

ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ু ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হলে ছোটো ছোটো জলকণার সৃষ্টি

হয়। এই জলকণা ভূপৃষ্ঠের কিছুটা ওপরের বায়ুস্তরে অনেকটা ধোঁয়ার মতো **কুয়াশা** হয়ে ভাসতে থাকে। এর কারণে অনেকসময় কয়েক মিটার দূরত্বের মধ্যে থাকা বস্তুকেও দেখা যায় না। ভারতের দিল্লী শহরে শীতের শুরুতে কুয়াশায় দৃশ্যমানতা (visibility) কমে যায়।

কুয়াশা

- সাধারণত শীতকালে জলাশয়ের ওপর কুয়াশা বেশি দেখা যায় কেন?
- কুয়াশার কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী সমস্যার সৃষ্টি হয় বা হতে পারে ক্লাসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয় রেনগজ (Raingauge) যন্ত্রের সাহায্যে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আলাদা। পৃথিবীর যেসব জায়গায় বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ এক সেই সব স্থানকে মানচিত্রে সমবর্ষণরেখা (Isohyet) দ্বারা যুক্ত করা হয়।

- বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্ন জায়গায় আলাদা হয় কেন?
- শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতের একটি মডেল তৈরি করে প্রতিবাত ও অনুবাত ঢাল চিহ্নিত করো।

৬

জলবায়ু অঞ্চল

- কোনো অঞ্চলের অক্ষাংশগত অবস্থানের ওপর তার জলবায়ু অনেকাংশে নির্ভর করে। ভূমির উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত জলবায়ুকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

- সমুদ্র সমতল থেকে যত উপরে ওঠা যায় বায়ুর উষ্ণতা তত কমে যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ পার্বত্য

অঞ্চলে উচ্চতার সাথে সাথে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল বদলায়।

এবার হিয়াদের স্কুলের সামার ক্যাম্প হয়েছিল হিমাচল প্রদেশের কুলুতে। ওদের বাসটা যতই উপরে উঠেছিল ততই আশেপাশের ভূমিরূপ, স্বাভাবিক উদ্ভিদ— সবই বদলে যাচ্ছিল। সমতলের শাল-সেগুনের জঙ্গল ছেড়ে ক্রমশই পাহাড়ের পাইন, লার্চ, পপলার-এর বন। আরও ওপরে, রোটাং পাস্-এ তো শুধুই ছোটো ছোটো ঘাস আর বরফ!

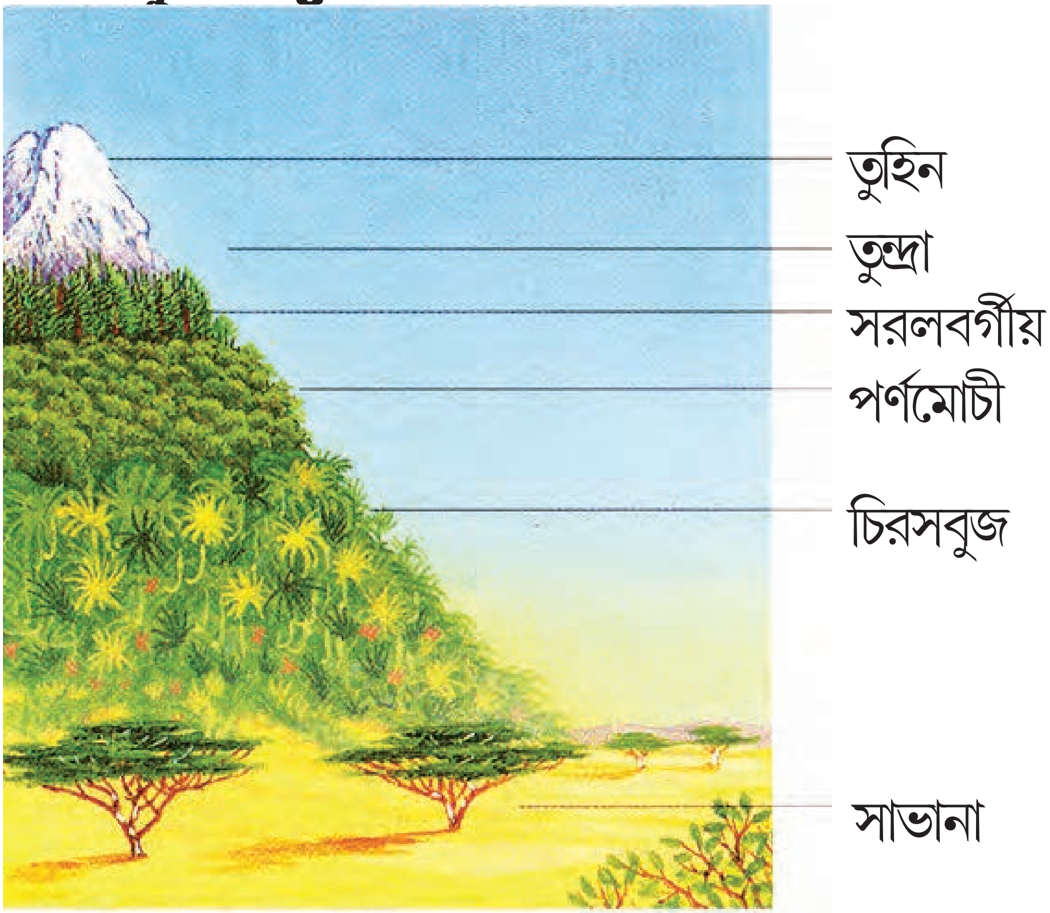

ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং সেইসঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তনও হয়।

➤ তোমরা কোথাও বেড়াতে গেলে, সেই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা, অবস্থানের পার্থক্যে তার বিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষ করে অঞ্চলটার জলবায়ুর প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে দেখো।

● পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উষ্ণতা-বৃষ্টিপাত এক এক রকম। ফলে আবহাওয়ার সামগ্রিক ধরনও আলাদা হয়। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে সারাবছর ধরেই প্রচণ্ড গরম আর প্রচুর বৃষ্টি। এই উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অনুকূল। ফলে বিশাল অঞ্চলজুড়ে ঘন গভীর চিরসবুজ অরণ্য (নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য) সৃষ্টি হয়েছে। আবার ক্রান্তীয় অঞ্চলে কোথাও বৃষ্টির অভাবে ছোটো ছোটো ঘাস-এর তৃণভূমি (সাভানা) আবার কোথাও রুক্ষ মরুভূমি। উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও শীতল সরলবর্গীয় গাছের অরণ্য; আবার মেরুবৃত্ত অঞ্চলের তুন্দ্রা জলবায়ুতে শুধু ছোটো ঘাস আর গুল্ম জন্মায়, কারণ প্রায় সারাবছরই এখানে উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকে।

নিরক্ষীয় চিরসবুজ

ক্রান্তীয় পর্ণমোচী

ভূমধ্যসাগরীয়

সাভানা

মরু

● কোনো একটি জলবায়ু অঞ্চলে (Climate Zone) জলবায়ুর উপাদান মূলত উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সমধর্মী হয়। বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জীববৈচিত্র্য — এমনকি মানুষের জীবনযাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।

আমারা মানচিত্রে কোনো জলবায়ু অঞ্চলকে অন্য জলবায়ু অঞ্চল থেকে সূক্ষ্ম রেখার মাধ্যমে আলাদা করলেও দুটো জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে সাধারণত একটা পরিবর্তনশীল অঞ্চল (Transitional Zone) থাকে। যেখানে একটা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে অপর অঞ্চলে মিশে যায়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলবায়ু অঞ্চল

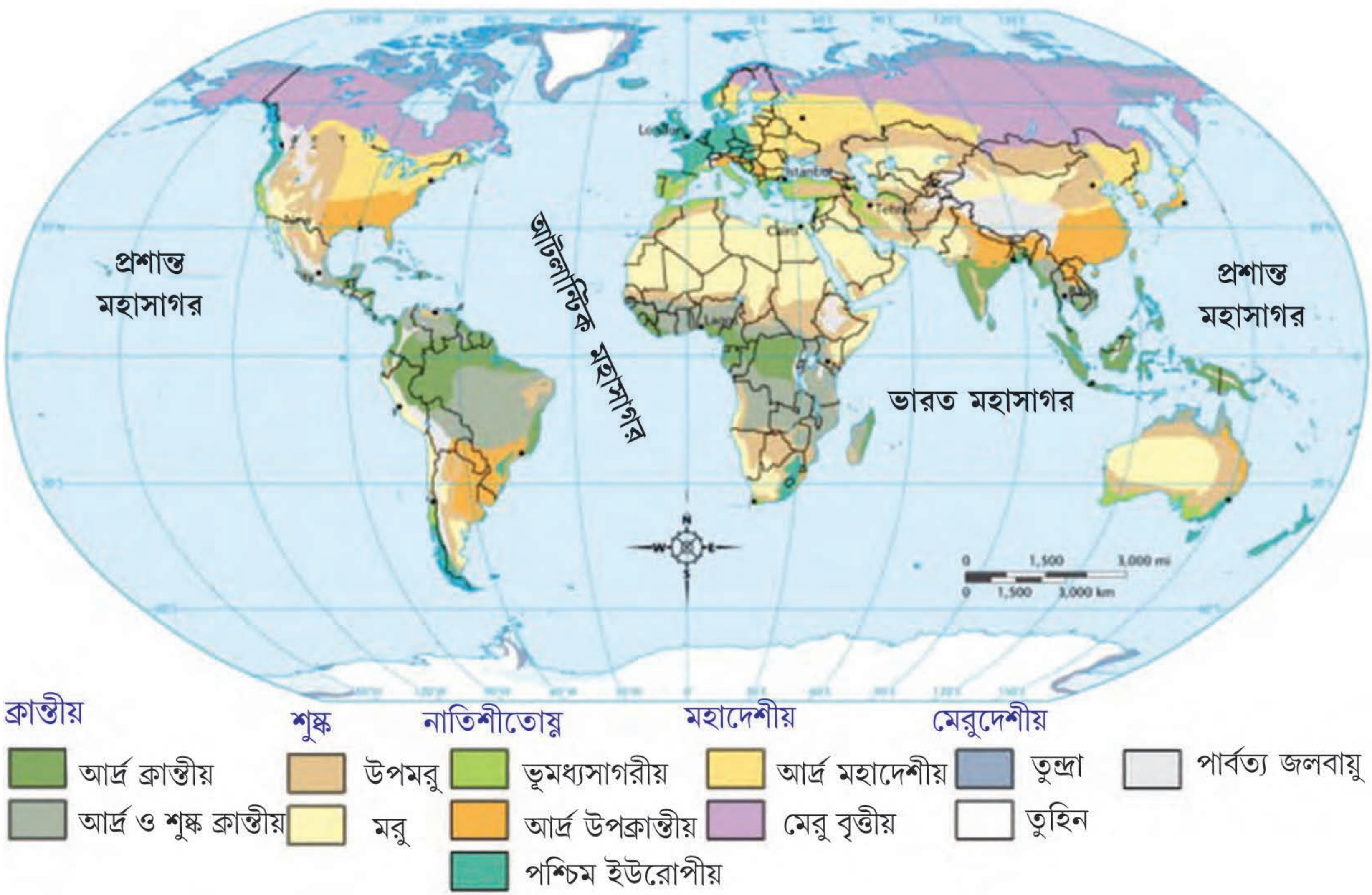

মঞ্জিশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আজ ওর Wild life Photographer মামার আসার কথা। পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে মামার বিভিন্ন অঞ্চলের গাছপালা, প্রাণীজগৎ ও মানুষের ছবি তোলেন। তাদের কেউ থাকে সাহারার উষ্ণমরুতে, কেউ গভীর নিরক্ষীয় জঙ্গলে, আবার কেউ থাকে বরফে ঢাকা মেরুপ্রদেশে।

— দূর, অচেনা দেশের এই সব মানুষের জীবনধারা আমাদের থেকে কত আলাদা!— অবাক বিস্ময়ে সে ভাবে আর রোমাঞ্চিত হয়।

● তোমরা তোমাদের নিজেদের অঞ্চলের পরিবেশের গাছপালা, প্রাণীজগৎ পর্যবেক্ষণ করো। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিন্যাস, বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখো। তোমার প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা) সংক্রান্ত সমীক্ষা পত্র তৈরি করো।

➤ লক্ষ করে দেখো— তোমার অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবেশ এবং জলবায়ুর কী প্রভাব আছে?

● 'জীবনযাত্রায় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ'—এই প্রসঙ্গে পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও বিতর্ক সভার আয়োজন করতে পারো।

উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল

নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে সারা বছর অত্যধিক উষ্ণতা আর প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে গভীর অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। এইকারণে এই অঞ্চলকে 'নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল' (Equatorial Rain Forest Region) বলা হয়।

অবস্থান : নিরক্ষরেখার দুই পাশে সাধারণত ৫°-১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়।

আফ্রিকার কঙ্গো বা জাইরে নদীর অববাহিকা; দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী অববাহিকা; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস; ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ; শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ অংশ; কলম্বিয়ার পশ্চিম উপকূল; মাদাগাস্কারের পূর্বাংশ; মধ্য আমেরিকার পানামা, কোস্টারিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিছু অঞ্চল এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

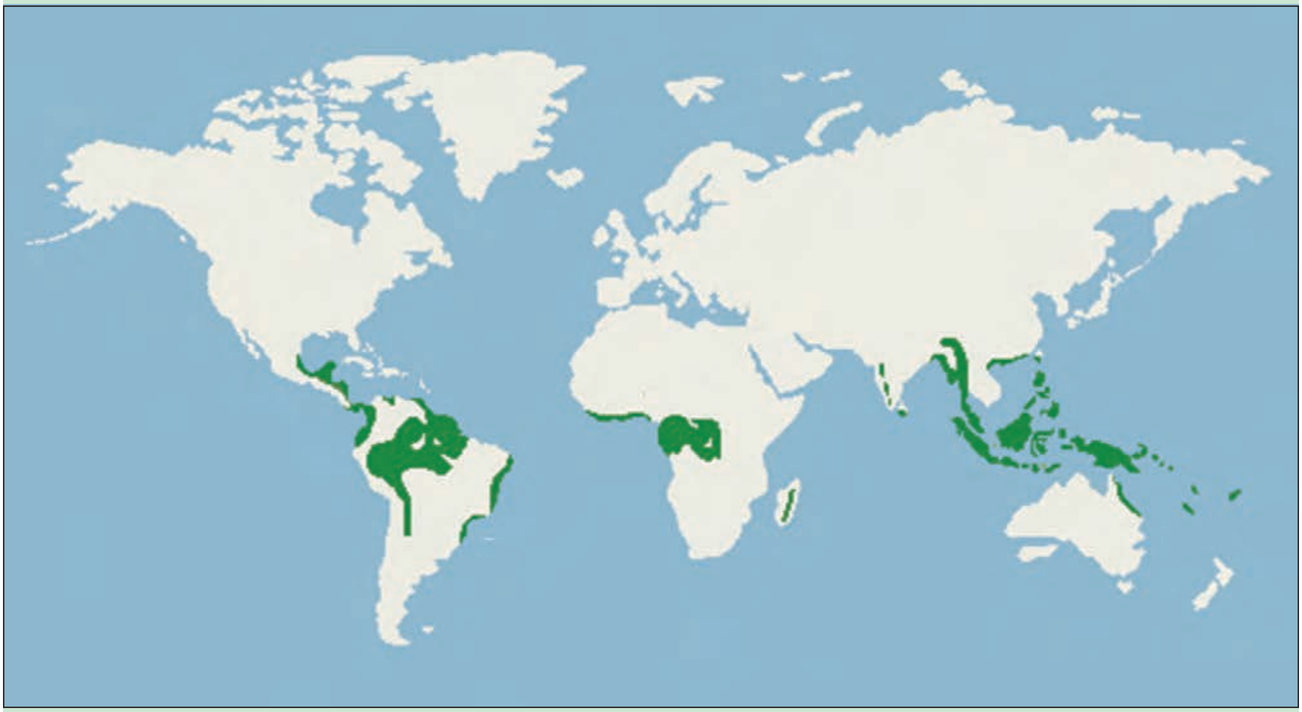

নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

উষ্ণতা - এই অঞ্চলে সারাবছর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে। ফলে উষ্ণতা সবসময়ই বেশি (বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৭° সে.)। বার্ষিক উষ্ণতা থাকে ২৫° সে. থেকে ৩০° সে.। বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর হয় মাত্র ২° সে. থেকে ৩° সে.। সেইসঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতাও বেশি থাকে। তবে রাতে উষ্ণতা বেশ কমে যায় (২৫° সে), তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে রাত্রি ক্রান্তীয় শীতকাল (Winters of tropics) নামে পরিচিত। সারাবছর ধরে দিন ও

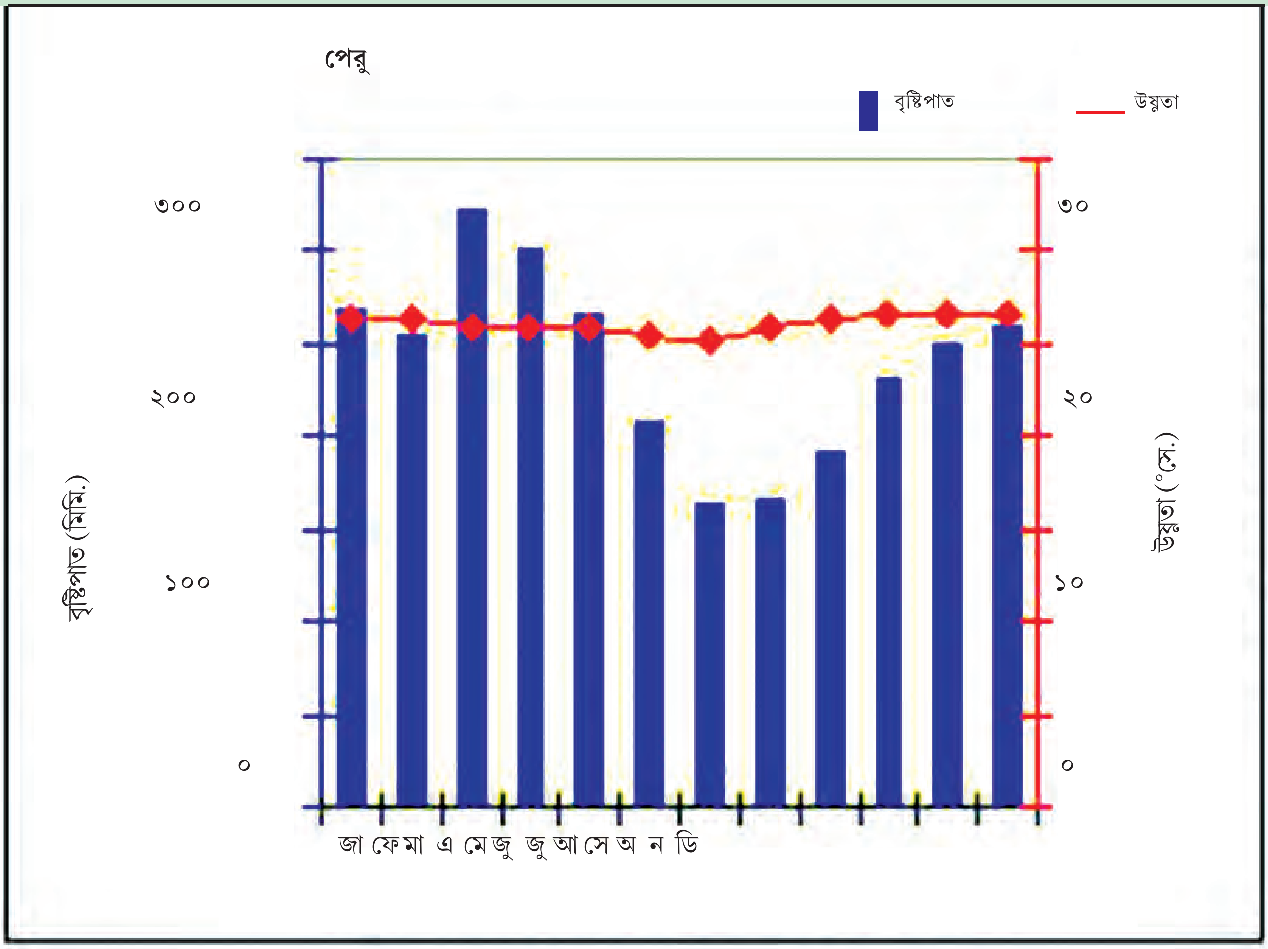

রাতের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে (১২ ঘন্টা)। এত কম বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর পৃথিবীর আর কোনো জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায় না।

বৃষ্টিপাত - সারাবছর বেশি উষ্ণতার কারণে এই অঞ্চলে গভীর নিম্নচাপ অবস্থান করে। এই অঞ্চলে স্থলভাগের থেকে জলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় প্রচুর জলীয়বাষ্প বাতাসে মেশে। এই উষ্ণ আর্দ্র বাতাস উর্ধ্বাকাশে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পরিচলন প্রক্রিয়ায় (Convectional rain) প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় (বার্ষিক ২০০ সেমি.-২৫০ সেমি.)। মোট বৃষ্টিপাতের দিনসংখ্যা বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ হয়। প্রায় প্রতিদিন সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। বিকেলের দিকে ৩-৪টের সময় ঘন কিউমুলোনিম্বাস মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। বজ্র বিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। তাই একে 4 O'clock rain বলে। আবার রাত্রিবেলা আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই জলবায়ু অঞ্চল নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় অর্থাৎ আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল (ITCZ) দ্বারা প্রভাবিত।

জীববৈচিত্র্য

স্বাভাবিক উদ্ভিদ — এই অরণ্যে সারা বছর গাছে সবুজ পাতা থাকে, ফুল ফোটে, ফল ধরে, তাই চিরসবুজ অরণ্য (Ever-green forest) বলা হয়।

নিরক্ষীয় অরণ্যের স্তর বিন্যাস

ব্রাজিলের আমাজন নদী অববাহিকায় এই ক্রান্তীয় অরণ্য ‘সেলভা’ নামে পরিচিত। এই অরণ্যে রবার, রোজউড, ব্রাজিল নাট, আয়রন উড, বাঁশ গাছ দেখা যায়। জাইরে (কঙ্গো) নদী অববাহিকার নিরক্ষীয় অরণ্যে মেহগনি,

র‍্যাফ্লেশিয়া

অর্কিড

রবার, পাম, কোকো, সিঙ্কোনা গাছের প্রাধান্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অরণ্যে শাল, সেগুন, আবলুস, রবার গাছ দেখা যায়। উপকূল অঞ্চলে প্রচুর নারকেল, তালগাছ জন্মায়।

এই অরণ্যে নানা প্রজাতির গাছ পাশাপাশি জন্মায়। ব্রাজিলের বৃষ্টি অরণ্যে ২ বর্গকিমি অঞ্চলে গড়ে প্রায় ৩০০ প্রজাতির গাছ দেখা যায়। পৃথিবীর আর কোনো অরণ্যে এত প্রজাতির গাছ দেখা যায় না। গাছগুলোর কাঠ শক্ত ও ভারী, গুঁড়ি খুব লম্বা, মোটা আর পাতাগুলো বেশ চওড়া হয়। গাছগুলো এমন

ঠাসাঠাসিভাবে থাকে, যে অরণ্যের ওপর চাঁদোয়ার (Canopy) মতো ঢেকে যায়। এর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো অরণ্যের তলদেশে পৌঁছতে পারে না। ফলে স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার তলদেশে নানা লতা, গুল্ম, পরগাছা গজিয়ে দুর্গম হয়ে ওঠে।

বন্যপ্রাণ — ঘন ও দুর্ভেদ্য অরণ্যে, গাছে চড়তে পারে এমন পশুপাখি, জীবজন্তুর আধিক্য। বাঁদর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, বিভিন্নরকম সাপ, পাখি, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ দেখা যায়। অরণ্যের তলদেশে হরিণ, গন্ডার, হাতি, জেব্রা ও নদী, জলাশয়ে প্রচুর কুমির, জলহস্তী রয়েছে।

ম্যাকাও

চিতাবাঘ

অ্যানাকোন্ডা

ওরাং ওটাং

টুকান

সোনালি বানর

ব্যাং

গরিলা

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রা

পিগমি

রেড ইন্ডিয়ান

বান্টু

অধিবাসী ও জীবনযাত্রা — উষ্ণ আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, বিপদসংকুল বন্যপরিবেশে জনবসতি বিরল। জাইরে ও আমাজন অববাহিকার তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলে লোকবসতি বেশি। জাইরে অববাহিকার পিগমি, উচ্চ আমাজন অববাহিকার রেড ইন্ডিয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেমাঙ ও অন্যান্য উপজাতির মানুষরা এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। বনের ফলমূল, বনজসম্পদ সংগ্রহ ও পশুশিকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা।

বর্তমানে অরণ্যের কাছাকাছি অঞ্চলে আদিম প্রথায়, স্থানান্তর কৃষির মাধ্যমে ভুট্টা, মিষ্টি আলু, ওল, কলার চাষ হচ্ছে। কোথাও কোথাও স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ করার প্রক্রিয়া ও শুরু হয়েছে।

- অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপন করে ইউরোপীয় বণিকরা এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় 'বাগিচা কৃষি' শুরু করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, জাভা, সুমাত্রায় রবার চাষ; পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আখ, কলার চাষ; আফ্রিকার গিনি উপকূলে কোকো ও তাল

(পাম) জাতীয় গাছের তেল উৎপাদন করে অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে।

খনিজ সম্পদ, শিল্প— মালয়-এ টিন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও-য় প্রচুর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। তবে স্থানীয় কৃষিজ, বনজ ও খনিজ দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে।

রবার

পাম

কফি

আখ

নারকেল

ব্রাজিলের কফি চাষ

সাম্প্রতিক অবস্থা— অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, দুর্গম জঙ্গল, বিষাক্ত কীটপতঙ্গের উপদ্রব, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব — সবই এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু বর্তমানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলে নতুন জনবসতি গড়ে উঠছে। ক্রমাগত চাহিদায়, বসতি, কৃষি, শিল্প, পরিবহন-এর প্রয়োজনে প্রতিদিন বিরাট এলাকার বৃষ্টি অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭০ সালে ট্রান্স-আমাজন হাইওয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চল বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই সঙ্গে জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।

ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকার অরণ্যের বিনাশ

গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ু

মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল

আরবি শব্দ 'মৌসিম' এর অর্থ 'ঋতু'। মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয়।

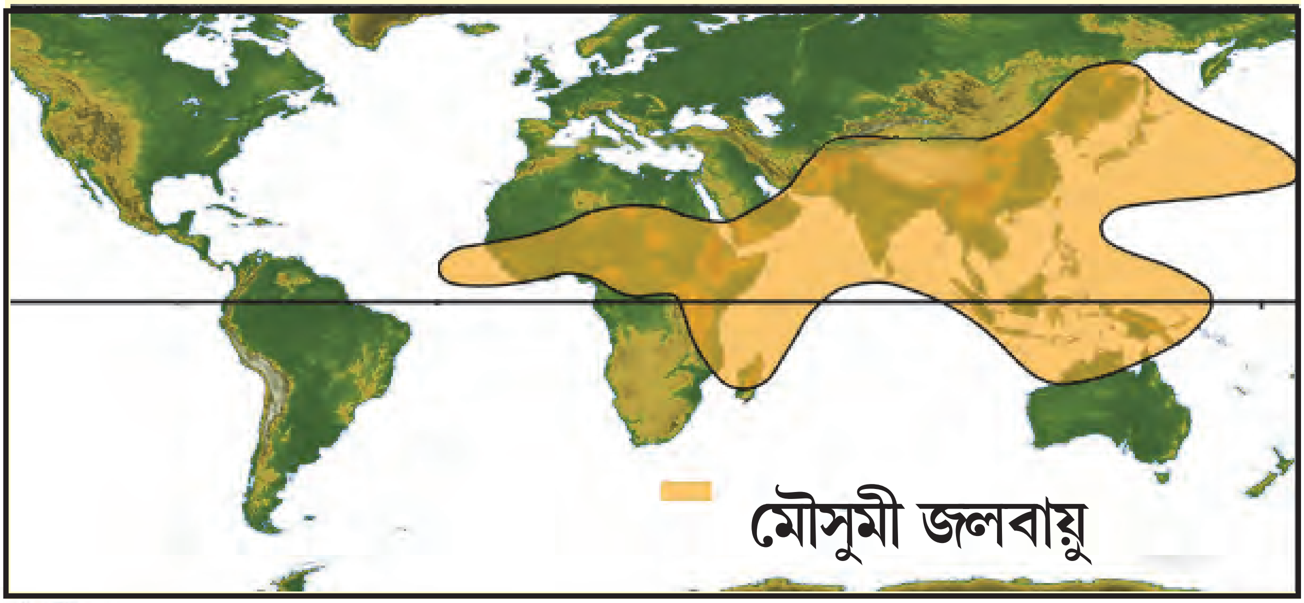

অবস্থান: উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ১০° থেকে ৩০° অক্ষাংশে মহাদেশের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলোতে মৌসুমি জলবায়ু দেখা যায়।

এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, কাম্পুচিয়া, দক্ষিণ চিন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব দেখা যায়।

এছাড়াও পূর্ব আফ্রিকার সোমালি, মাদাগাস্কার;উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের কিছু অঞ্চলে এই জলবায়ু অনুভূত হয়।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

শীত গ্রীষ্মে বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ, উষ্ণ-আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, শুষ্ক শীতকাল মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান

বৈশিষ্ট্য। এই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোতে প্রধান চারটে ঋতু লক্ষ করা যায়।

শীতকাল (নভেম্বর- জানুয়ারি) : গড় তাপমাত্রা সাধারণত ২৫°সে.। উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু' রূপে প্রবাহিত হয়। এর প্রভাবে সারা ভারতে বৃষ্টি না হলেও করমণ্ডল উপকূল,